উপসংহার

আধুনিক কালে 'নারী' যখন সারা বিশ্বেই অন্যতম আলোচনার বিষয়, নারীর দৃষ্টিতে সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাসকে পুনর্মূল্যায়নের একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তখন সমাজ বদলের সাক্ষ্য বহনকারী নাট্যসাহিত্যে নারীমুক্তি, লিঙ্গরাজনীতি, নারীভাবমূর্তি নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়গুলি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজকের দিনে সাহিত্যে নারী প্রসঙ্গটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। ইতিহাসে যেমন His Story -র পাশাপাশি Her Story আবিষ্কারের একটা প্রাচেষ্টা শুরু হয়েছে, সাহিত্যেও তেমনি মেয়েদের রচিত সাহিত্য ও সাহিত্যের মেয়েদের লুপ্ত অধ্যায়ের পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্লেষিত হচ্ছে সাহিত্য রচনার বিন্যাস, খুঁজে বের করা হচ্ছে রচনার অসঙ্গতিজনিত নীরবতা, উদ্দেশ্যমূলকতা (Intension), নারীভাবমূর্তি নির্মাণের পেছনের মতাদর্শগত ঝোঁক (Hegemony), প্রান্তিক বা নীরব করে দেওয়া নারীদের খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া। সাহিত্য সমালোচনার এই বিশেষ ধারাকে বলা হচ্ছে নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা রীতি। যদিও এই রীতির কয়েকটি ধারা বিদ্যামান যেমন — ইঙ্গমার্কিণ, ফরাসী, উত্তর আধুনিক ইত্যাদি।

কিন্তু আমরা সেই বিভাজনে না গিয়ে এর সামগ্রিক আবেদনকে গ্রহণ করেছি, কিছু বর্জনও করেছি, যেমন একজন লেখক পুরুষ হলেই তিনি নারী চরিত্র নির্মানে পুরুষতান্ত্রিক ভাবধারার শিকার হবেন, নারী হলেই এর উল্টোটা হবে, এমন কোন প্রাক্-ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা কোন রচনা বিশ্লেষণ করিনি। কারণ বাস্তবে পুরুষতান্ত্রিক ভাবধারার বাহক নারী লেখকের সংখ্যার অভাব নেই, আবার উল্টে টাও সত্যি। তাই মেয়েদের লেখা এবং মেয়েদের সম্পর্কিত লেখাকেই আমরা আমাদের আলোচনায় একমাত্র আলোচ্য করিনি। সামগ্রিক ভাবে মেয়েদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও মানসিক অবস্থার বিবর্তনের একটা রূপরেখা তৈরীর চেষ্টা করেছি ধারাবাহিক ভাবে কিছু নাট্য বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে। বাস্তবের নারীর সঙ্গে নাটকের নারীর যে ফারাক তাও নির্দেশ করার চেষ্টা হয়েছে এখানে। তাছাড়া মতাদর্শগত ঝোঁকের কারণে সাহিত্যে যে নীরবতা সৃষ্টি হয়েছে সেই নীরবতাকে চিহ্নিত করে ব্যক্ত পাঠ্যবস্তুর পেছনের অব্যক্ত পাঠ্যবস্তুর (Inner Text) সন্ধান করা হয়েছে। এভাবেই আমরা নারীসত্তা নির্মাণ প্রক্তিয়াটির অন্বেষণ করেছি।

এই প্রক্রিয়ায় নাট্য বিশ্লেষণকে আমরা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছি — প্রথম পর্যায় ঃ রামনারায়ণ তর্করত্ন থেকে শুরু করে 'নবান্ন' নাটকের আগে পর্যন্ত (৩)। দ্বিতীয় পর্যায় ঃ গণনাট্য সংঘ থেকে নবনাট্য হয়ে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের গ্রুপ থিয়েটার পর্যন্ত বিস্তৃত (৪)। তৃতীয় পর্যায় ঃ সাম্প্রতিক কালে অভিনীত নির্বাচিত কিছু গ্রুপ থিয়েটার।

বাংলা নাটক সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার নিয়েই প্রথম রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। প্রথম কয়েকজন নাট্যকার এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। পরবর্তী কালেও সমাজের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে নাটক/প্রহসন রচিত হয়েছে। উনিশ শতকে 'যে কটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলনের মারফত আধুনিক ভারতবর্ষের শাসক শ্রেণীর উপযুক্ত মতাদর্শ প্রস্তুত হচ্ছিল সব কটির মধ্যেই মেয়েদের একটা বিশিষ্ট জায়গা করে দেওয়া হয়েছে — যেমন সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা বিবাহ, Age of consent সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি। অনেক সময়েই এগুলি আনা হয়েছে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রের উপযুক্ত পুরুষদের মূল্যায়নের তাগিদেই। কিন্তু এর মধ্যে দিয়েই প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালে তৈরী হয়েছে মেয়েদের নিজস্ব ইতিহাস, কখনও মূল ধারার সঙ্গে সংঘর্ষে কখনও বা সমঝোতায়।'[১] তাই নারীদের সমস্যা সেই সময় সবচেয়ে জ্বলন্ত সমস্যা বলে চিহ্নিত হতে পেরেছিল। সতীদাহ প্রথা রদ্ হলেও বাল্য বিবাহ, কৌলিন্য প্রথার কুফল বহু বিবাহ, অকাল বৈধব্য ইত্যাদি হিন্দুনারীর জীবনকে বিষময় করে তুলেছিল — নিজেদেরকে পুরুষমানুষের মত মানুষ বলে ভাবা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, বেঁচে থাকার নূন্যতম জৈবিক চাহিদাটুকু মিটলেই নিজের জীবন ধন্য মনে করতো। প্রথম পর্বের রাম নারায়ণ তর্করত্ন বা উমেশচন্দ্র মিত্রর নাটকে নারীদের এই করুণ অবস্থাকে বাস্তবোচিত ও অত্যন্ত মর্মস্পর্শী রূপে তুলে ধরা হয়েছে।

মেয়েদের এই অবমানব হয়ে বেঁচে থাকা — যা পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতিতে আলোকিত যুবকদের লজ্জিত ও পীড়িত করছিল, যার পরিবর্তনে তারা আগ্রহী হয়েছিলেন — মেয়েরো যে তাকে ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছিল, আলোচ্য পর্বের নাটক সেই বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে। অর্থাৎ নাট্যকারেরা তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেই নাটক রচনা করেছেন। রামনারায়ণের 'কুলীন কুল সর্বস্ব' ও 'নবনাটক'-এ কৌলিন্য প্রথার কুফল দেখানো হয়েছে। দুটি নাটকেই সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব স্পষ্ট।

উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক'-টিও উদ্দেশ্যমূলক, নাট্যকার উদ্দেশ্য সাধনে যত্নশীল। তাই বিধবা বিবাহ না হওয়ার কুফল যেমন দেখিয়েছেন তেমনি বিধবা হলেই মেয়েদের কামনা-বাসনা যে একেবারে নিঃশেষ হয়না তাও দেখিয়েছেন, বিধবাদের উপর দেবত্বের আদর্শ চাপিয়ে তাদের 'না - মানুষ' করে তোলার যে লিঙ্গ রাজনীতি (Sex Politics) , তাকে তীব্র ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন নাট্যকার।

রামনারায়ণ এবং উমেশচন্দ্র উভয়েই উনিশ শতকের নারীর সামাজিক অবস্থানের যথাযথ চিত্রায়ণ করেছেন। যখন নারীর বেঁচে থাকাটাই ছিল পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার, তখন মুক্তির চেতনা আসা অসম্ভব — আসেওনি, তবে মুক্তির লক্ষ্যে যাত্রা শুরুর প্রারম্ভিক পর্যায়ে নারীর সামাজিক অবস্থার জীবন্ত দলিল

হিসেবেই এর ঐতিহাসিক মূল্য।

তবে উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল নারীকে শুধু বেঁচে থাকার অধিকার নয়, তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালীর চেতনায় নারী সম্পর্কিত ধারণায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল তার বেশীর ভাগটাই ছিল মনোজগতে, সমসাময়িক সমাজ বাস্তবতায় নয়। হয়তো সেজন্যই মধুসূদনকে নারীর আত্মবিকাশের ক্ষেত্র খুঁজতে হয় ইতিহাস কিংবা পুরাণে। তবে তার পৌরাণিক নারী চরিত্রদের কণ্ঠে কথা বলে নবজাগরণের চেতনা-ঋদ্ধ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন উনিশ শতকের নারী। যদিও তার মধ্যে একদিকে যেমন কাজ করেছে নারী ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার নবজাগ্রত চেতনা অন্যদিকে বাঙালী জীবনের পারিবারিক মূল্যবোধ — নারীর কল্যাণী রূপের প্রতি আকাঙ্খা। তাই যেমন তিনি মর্মে বিদ্রোহী দেবযানী, চিত্রাঙ্গদা বা প্রমিলাকে এঁকেছেন তেমনি সীতা - সরমা - শর্মিষ্ঠাকেও এঁকেছেন — কোন্ দিকে যে তার মমত্ব বেশী তা বলা দুষ্কর।

মধুসূদনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'র নায়িকা চরিত্রটির ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকলেও সে আদ্যন্ত এক রোম্যান্টিক নায়িকা। কোন এক ঈপ্সিত অলীক জগতের হাতছানিতে তার হৃদয় এবং দৃষ্টি স্বপ্নাচ্ছন্ন — সুতরাং তার কাছ থেকে উনিশ শতকের নবজাগ্রত চেতনার সাক্ষাৎ পাওয়া যে যাবেনা তা বালাই বহুল্য। তবে এই নাটকের অনৈতিহাসিক চরিত্র মদনিকা ও বিলাসবতী নবজাগ্রত চেতনার সৃষ্টি বলেই মনে হয়। নাটকীয় ঘটনার জটিলতা বৃদ্ধি ও গতি সঞ্চারেও এরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের চিত্রাঙ্গদা রাজঅন্তঃপুরের অবরোধ ভেঙে এসেছিল প্রকাশ্য রাজসভায় ,প্রমীলা এসেছে রাজপথে — নারীসম্পর্কিত প্রচলিত ভাবনাকে নস্যাৎ করে, যোদ্ধার বেশে। তবে মধুসূদনের সর্বাধিক বলিষ্ঠ, মুক্ত ও সাহসী নারীরা আত্মপ্রকাশ করেছে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে। (কিন্তু মধুসূদন তার কাব্যে নারী প্রসঙ্গে যতখানি বলিষ্ঠ ও সোচ্চার নাটকে ততখানি নন।) তার কোন নাটকের নায়িকাই আমাদের পরিচিত কোন মানবী নয়, চারিত্র্যধর্মে কেউ কেউ তার বিদ্রোহী মানসের সন্তান হলেও অন্য ভাবনার খোরাক জোগাতে পারেনা। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে 'ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী' — যারা বাঙলাদেশে প্রথম নারী মুক্তির ভাবনা নিয়ে এসেছে, শুধুমাত্র অবরোধ মুক্তি নয় নারী-পুরুষের সাম্যের কথা বলেছে[২] — তাদের যে একপেশে উচ্ছৃঙ্খল ও নীতিহীন চিত্র হাজির করেছেন তা মধুসূদনের ঐতিহ্যের দিকে মুখ ফেরানোর ইঙ্গিত দেয় কি না, প্রশ্ন জাগে। নতুন যুগে নতুন মূল্যবোধের সংঘাতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চিন্তাজগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল গদ্যে তার প্রকাশ ঘটলেও, ১৮৫৯ খ্রীঃ বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাবের আগে তার প্রকাশ ঘটেনি — বাংলা কাব্যে আধুনিকতার আবির্ভাবে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন মধুসূদন, অথচ বস্তুনিষ্ঠ নাট্য শিল্পে কেন যে তা অনুপস্থিত তা আমাদের ভাবায়। সামাজিক

দায়বদ্ধতার যে বোধ থেকে রামনারায়ণ বা উমেশচন্দ্র লেখনী ধরেছিলেন, সেই বোধ থেকেই দীনবন্ধু রচনা করেন তাঁর কালজয়ী নাটক 'নীলদর্পন' — ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক চাপ ও অত্যাচার অবিচারের সোচ্চার প্রতিবাদ রূপে। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এই নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্য বলে নারী চরিত্র অঙ্কনে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিতে পরেননি, একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে যে বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভূত প্রসংশিত হয়েছিলেন, নারী চরিত্র নির্মাণে তাঁর সেই বাস্তব দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়েছিল, একথা বলতে আমরা বাধ্য। নারীচরিত্র নির্মাণে তিনি হিন্দু ঐতিহ্যিক চেতনার দ্বারা চালিত হয়েছেন এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের 'আদর্শ' নারীদের তুলে ধরেছেন। তাই সাবিত্রি, সরলতা, সৈরিন্ধ্রি স্বার্থলেশহীন ভাবে শুধুই ভাল। দেবসেবা, অতিথি সংস্কার, আত্মীয়স্বজন পালন ও সংসারের সমস্ত কাজে তাদের সজাগ দৃষ্টি।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথের মধ্যে দিয়ে বাংলা নাটক ভাবের দিক থেকে এক নতুন পর্বের সূচনা ঘটায় — জাতীয় ভাবোদ্দীপনা জাগানোই ছিল এই নাট্যকারদের উদ্দেশ্য। যদিও জ্যোতিরিন্দ্র নাথ এই উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক নাটক লিখলেও ঐতিহাসিকতা রক্ষার ব্যাপারে ততটা যত্নশীল ছিলেন না, যতটা র‍্যোমান্টিক প্রণয় গাথার ব্যাপারে তার দৃষ্টি ছিল। তার অধিকাংশ নাটকের পাত্র পাত্রীরা নাট্যকারের কোন 'আইডিয়া' বা ভাবকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। নারী চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি কবি সুলভ রোম্যান্টিকতার দ্বারা চালিত হয়েছেন। তার অধিকাংশ নারীচরিত্র বৈচিত্র্যহীন, সকলেই এক ধরণের — সরলা, পতিপ্রাণা বা প্রেমিকের প্রতি একনিষ্ঠা এবং সহনশীলা। স্বদেশ হিতব্রতে দীক্ষিত হলেও হৃদয় ধর্মের দ্বারাই মূলত চালিত।

প্রথম জীবনের রবীন্দ্রনাথও নারী সম্পর্কিত ধারণায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই উত্তরসূরী বলা যায়। যদিও তাঁর ধারণা ক্রম-বিবর্তিত হয়েছে। প্রথম দিকে ('মানসী'র যুগ) কবির মনে একদিকে আদর্শ হিন্দুনারীর সুমঙ্গলা রূপ, অন্য দিকে অর্ধেক কল্পনা বা আকাঙ্খা আর বাস্তবের সংমিশ্রনে গড়ে ওঠে নারী ধারণা। 'সোনার তরী'-তে একদিকে মানস সুন্দরী অন্য দিকে শ্বাশ্বতী কল্যাণী চিরন্তনী গৃহলক্ষ্মী। কাব্যনাট্যগুলির মধ্যে একমাত্র 'চিত্রাঙ্গদা'-য় তিনি স্বতন্ত্র নারী ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। চিত্রাঙ্গদার আত্মোন্মোচন, আত্মসচেতনতা (আমি চিত্রাঙ্গদা/ দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী) তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেই পরিস্ফূট করে।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা আরো সংহত হয়। নারীকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায় তাঁর 'খাতা' 'অপরিচিতা', 'বোষ্টমী', 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র' 'ল্যাবরেটরী' প্রভৃতি ছোট গল্পে। কিন্তু বাস্তবানুসারী চরিত্র সৃষ্টিকারী রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যাচ্ছেনা তাঁর নাটকে। তাঁর নাটকের নারীদের বাস ভাবজগতে, হয় তারা কোন 'আইডিয়া'-র বাহক না হয় সৌন্দর্যলক্ষ্মী।

কারণ ঘটনা দ্বন্দ্ব নয়, ভাবদ্বন্দ্বই রবীন্দ্র নাটকের প্রাণ — নারী চরিত্ররা 'রিয়্যাল' আর 'আইডিয়াল' এর মিশ্রণে গঠিত। 'প্রেম' আর 'অহং' এর দ্বন্দ্বে প্রেমের প্রধান আশ্রয়স্থল হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন নারীকে। 'অহং' এর কারাগারে বন্দী পুরুষ মানুষটির কাছে মুক্তির দূতী হয়ে আসে প্রেম-স্বরূপা কোন নারী। রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত নারীরা '... অতি বিশেষ ভাবে মেয়েও নয়, পুরুষও নয়। ... তারা নিজের স্বতন্ত্র শক্তিতে নিজের জীবনকে ও জগৎকে সৃষ্টি করে।'[৩]

তাঁর এই আকাঙ্ক্ষিত নারীর ছায়া লক্ষ্য করি সামান্য পরিমাণে হলেও 'বিসর্জন'এর অপর্ণার মধ্যে (তবে প্রশ্ন জাগে সামাজিক বন্ধনহীনতার কারণেই কি অপর্ণা সমাজ-নির্দিষ্ট নারী ভূমিকার বিপরীত আচরণ করতে পারে?) এবং মালিনীর মধ্যে। নতুন এক ধর্মবোধে আচ্ছন্ন হয়ে সে পুরুষ-নিরপেক্ষ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

যদিও রবীন্দ্রনাথের নারীরা সমস্ত কিছুই করে 'অন্তরের দায়' থেকে। এই দায় থেকেই 'তপতী'র সুমিত্রা অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছে, 'রাজা ও রাণী'র সুমিত্রা ঘর ছেড়ে পুরুষবেশে পথে বেরিয়েছে। তবে তার এই পথে বেরোনো কোন ভাবেই 'A Dolls House' এর নোরার মত নয়। কারণ নোরা বেরিয়ে ছিল আত্মঅন্বেষণে আর সুমিত্রা বেরিয়েছে রাজ কর্তব্য বিস্মৃত স্বামীর সম্বিত ফেরানোর উদ্দেশ্যে — সে পালন করেছে 'যোগ্য সহধর্মিণীর' ভূমিকা।

চিত্রাঙ্গদার' মধ্যে যে দ্বন্দ্ব অস্ফুটে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাই তত্ত্বের আকারে পরিপূর্ণ ও গভীর ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে রাণী সুদর্শনার ('রাজা') উপলব্ধিতে — সীমা যেখানে রূপের আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা, অসীম সেখানে শুধুই অরূপ। প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চৈতালী' পর্যন্ত যে নারী ভাবনার দ্বারা জারিত ছিলেন, নাটকেও আমরা সেই রবীন্দ্রনাথকেই পাই। 'রক্ত করবী'র নন্দিনীকে যদিও রবীন্দ্রনাথ মানবী চেতনায় জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছেন তবু সে বাস্তবের কোন চেনা মানবী নয়। নন্দিনী যেন এক মূর্তিমতি প্রেম — সৌন্দর্য, মানবতা, প্রকৃতি। সে লীলাময় প্রাণের প্রতীক। নারী তার কাছে স্বাভাবিক ছন্দের বন্ধনে রচিত এক সম্পূর্ণ সুন্দর কবিতা।

পৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটকের জনপ্রিয় নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। 'বলিদান' তার মধ্যে অন্যতম, যেখানে সামাজিক সমস্যা (পণপ্রথা) সম্পর্কে তিনি প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তবে তিনি হিন্দু শাস্ত্রানুসারী সতীত্বকে নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করেন বলে তার নারী চরিত্ররাও স্বামীর চিন্তা ও ভক্তিতে তন্ময় এবং বিভোর। আলোচ্য নাটকের কিরণময়ী ও জোবীর স্বামী নরাধম ও পাষণ্ড হলেও স্ত্রীর কাছে পরম আরাধ্য দেবতা। এরা স্বামীকে চেনেনা, জানেনা,

বোঝেনা — স্বামীরূপ 'আইডিয়া' কেই পূজা করে যায়। তার নারীরা শাস্ত্রচালিত, হৃদয়চালিত নয়, ভাল মন্দ, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জর্জরিত রক্তমাংসের নারী তারা নয় — কতকগুলি 'আইডিয়া'র ধারক ও বাহক।

পরিবারের মঙ্গল বিধানের জন্য সর্বস্বত্যাগ, ঐতিহ্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ, ধর্মীয় আচার বিচারে সজাগ দৃষ্টি, সেবার মনোভাব, সর্বোপরি স্বার্থলেশ রমনীই হিন্দু পরিবারের আদর্শ বলে দেখানো হয়েছে। গিরিশ চন্দ্র ঘোষ নারীর এই সর্বংসহা মাতৃমূর্তিই অঙ্কণ করেছেন নাটকে। তবে গিরিশ ঘোষের এই আদর্শায়িত নারীরা কতটা বাস্তবানুসারী ছিলেন সে প্রশ্ন থেকেই যায়, কেননা তৎকালীন একান্নবর্তী পরিবারের 'কর্ত্রীদের জবানবন্দী' (রাস সুন্দরীর আত্মজীবনী বা অন্য অনেকের চিঠি) এর বিপরীত সাক্ষ্যই দেয়।

গিরিশ চন্দ্র ঘোষ উনিশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, যে রাজনীতির ধারণায় হিন্দুজননীর ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল ও বহুকীর্তিত। 'এই গৌরব, এই প্রকান্ড তাৎপর্যময় সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা দাঁড়িয়ে আছে হিন্দুনারীর দ্বিধাহীন প্রশ্নহীন, প্রেমময় আত্মনিবেদনের উপর ...' [৪] মনুর আদর্শের বাহক এই নারীরা পুরুষের আকাঙ্ক্ষিত 'অপর' হয়েই থেকেছে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য মন্ডিত নারী হয়ে ওঠেনি, উত্তরণের কোন সুপ্ত আকাঙ্খাও তাদের মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়নি।

গিরিশ চন্দ্র ঘোষের ভক্তিরসের প্রবল প্রতিবাদ রূপে নাট্য জগতে আবির্ভূত হন দ্বিজেন্দ্র লাল রায়। যদিও জাতীয় ভাবোদ্দীপনা জাগানো ছিল দু'জন নাট্যকারেরই উদ্দেশ্য, সেজন্য একজন আশ্রয় করেছিলেন ধর্মকে অন্যজন ইতিহাসকে। আমাদের দেশে নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। সেই কাঙ্খিত নারী ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মন্ডিত কল্যাণী নারী। সেই কল্যাণস্নিগ্ধ জীবনের বাসনাকে আশ্রয় করেই ক্রমশ জাতীয় ভাবনা ও স্বদেশ প্রেমের উদ্ভব ঘটে, যা লক্ষিত হয় দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে। ঐতিহাসিক নাটকে তার অঙ্কিত নারী চরিত্ররা অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকা নয়, প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী বীরাঙ্গনা, পুরুষের কর্মক্ষেত্রে পার্শ্বচারিণী অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিনী। জাতীয় মন্ত্রে দীক্ষিত দ্বিজেন্দ্রলাল পরাধীনতার ক্ষুব্ধ জ্বালা ও অপমানের কথা ফুটিয়ে তুলে অতীত ইতিহাসের মধ্যে আশার আলো দেখাতে চেয়েছেন। তাই অধিকাংশ নারী চরিত্রই জাতীয় ভাবাবেগের বাহন হয়েছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে দেশের পুরুষ নেতৃত্বের নারীদের সাহায্য প্রয়োজন ছিল এবং সেজন্য তারা ভারতীয় দেশজ হিন্দু ঐতিহ্যের ভাবমূর্তির দিকে তাকিয়ে ছিল, এবং এই ভাবনায় দেশ হয়ে যায় মাতা। দেশকে মাতৃকারূপী দেবী রূপে কল্পনা করার ফলে বাস্তবে নারী শক্তির ধারণা বলিষ্ঠ হয়। জাতীয়তাবাদের আলোকপুষ্ট এই শক্তিরূপিনী নারীরা আত্মপ্রকাশ করেছে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে। তবে পারিবারিক মাধুর্য রসে স্নিগ্ধ কল্যাণী নারী রূপই যে তাঁর আকাঙ্খিত ছিল তা ঐ বীরাঙ্গনাদের দিকে গভীর দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায়। মেবার

পতন নাটকে কল্যাণী প্রেম, সত্যবতীর চির-অপূর্ণ পূর্বরাগ, সত্যবতীর দেশ-গৌরবদীপ্ত মার্তৃত্ব, সমস্ত কিছুর মধ্যেই তা প্রত্যক্ষ করা যায়।

নূরজাহান চরিত্র চিত্রণেও দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যমানস নারী মনের যে পরস্পর বিরোধী — 'নারী সুলভ' ও 'অনারীসুলভ' বৈশিষ্ট গুলিকে উন্মোচিত করেছেন তা ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পুরুষের নারী শিক্ষা ও আদর্শ নারী সম্পর্কিত ধারণার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরস্পর বিরোধী মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু বাংলাদেশের কল্যাণব্রতী পরিবার প্রেমলীনা নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের রহস্য সন্ধানী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এখানেই থেমে থাকতে পারেননি। তাই নাটকীয় ঘটনা সংঘাতের মাধ্যমে অগ্নিক্ষরা জীবনযুদ্ধের বহিরঙ্গে যত জ্বালা ও পাপ পুঞ্জিভূত হয়েছে তা অন্তরে অন্তরে নূরজাহানের নারী সত্তাকে পীড়িত করেছে, যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে। যার ভয়ঙ্কর পরিণাম লক্ষ্য করা যায় সহায-সম্বলহীনা উন্মাদিনী নূরজাহানের করুণ পরিণতির মধ্যে। শুধু তাই নয় নাট্যকার দেখিয়েছেন নূরজাহানের মধ্যে নারীর মাধুর্য (নারীর আবশ্যিক গুণ) উচ্চাশার (নারী সুলভ নয়) আগুনে দগ্ধ হয়ে উন্মত্ত পৈশাচিকতার রূপ ধারণ করেছে। অর্থাৎ দ্বিজেন্দালাল তাঁর পূর্বসুরীদের নারীভবনা থেকে অনেকটা এগিয়ে এলেও কল্যাণী নারীই তাঁর কাম্য — উচ্চাকাঙ্খী নয়।

যদিও যুগের তুলনায় তিনি ছিলেন যথেষ্ট প্রগতিশীল কোথাও কোথাও বৈপ্লবিকও বটে, যেমন 'পাষাণী' নাটকে। কাহিনী এবং চরিত্র পৌরাণিক হলেও পৌরাণিক নাটকের পূর্ব ধারণাকে এখানে তিনি আমূল বদলে দিয়েছেন। নাটকের অহল্যা রক্ত - মাংসে - গড়া ব্যক্তিত্ব মন্ডিত নারীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, যে সমাজের দ্বিচারিতাকে প্রশ্ন করেছে — একই দোষে দোষী হয়ে পুরুষ ছাড় পেয়ে যায় আর নারীকে শাস্তি পেতে হয় কেন? যে ধর্মে স্বামী - স্ত্রীর সম্পর্ককে জন্ম জন্মান্তরের বন্ধন, কপালের লিখন বলে মনে করা হয়, সেখানে নিজের অসম বয়সী বিবাহ নিয়ে যে প্রশ্ন অহল্যা তুলেছেন তা প্রতিস্পর্ধী। এ প্রসঙ্গে নারীর কামনা - বাসনার ছবিই শুধু দ্বিজেন্দ্রলাল ফুটিয়ে তুললেননা, এমন এক চরিত্রকে (অহল্যা) আশ্রয় করে তা প্রকাশিত হল — যাকে রক্তমাংসের মানবী নয়, দেহ কামনাহীন দেবী ভাবতেই বাঙালী মন অভ্যস্ত ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত চিরাচরিত হিন্দুনারীর আদর্শকেই জয়ী করেছেন নাট্যকার। স্বামীই তার ইহকাল পরকাল এবং ত্রিভুবনের সার — এই আত্মোপলব্ধিতেই অহল্যার চিত্তশুদ্ধি ঘটেছে।

রামনারায়ণ তর্করত্ন থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পর্যন্ত যাত্রাপথ দীর্ঘ হলেও এর মধ্যে নারীর অবস্থার কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়নি, তবে সামাজিক অবস্থান ও মানসিক স্তরের পরিবর্তন (নারী পুরুষ উভয়েরই) যে হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের নারীকে জন্তুদশায়

দিন কাটাতে হয়না, তাদের মরণ-বাঁচন পুরোটাই পুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এমন কথা বলা যাচ্ছেনা, শুধুমাত্র অবহেলা, অবজ্ঞা আর দয়ার পাত্রী নয় নারী। বরং সে মহিমান্বিত, দেবী বা দেশ মাতৃকার সঙ্গে একাত্ম — ফলে নারী সম্পর্কে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই পরিবর্তন এসেছে। নারীর অধিকারের ধারণা, স্বাতন্ত্র্যের ধারণাকে ধর্ম বা দেশপ্রেমের মোহজালে ঢেকে রাখা হয়েছে। আবরণ ভেদ করে স্বাতন্ত্রের দীপ্তি কখনও চোখে পড়ছে, (অহল্যা, মানসী) কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পন করছে কোন পুরুষের কাছেই।

দ্বিজেন্দ্রলালের নারী পুরুষ-নির্ভরতা কাটিয়ে উঠবে এমন দুরাশা করার কোন কারণ নেই কারণ নারীমুক্তির আকাঙ্খা কোন মস্তিষ্ক প্রসূত ব্যাপার নয়, তার বীজ আছে বস্তুজগতে। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে তা গভীর ভাবে যুক্ত, যদিও সমাজে ক্রিয়াশীল নানা বিরুদ্ধ-শক্তির দ্বন্দ্বে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় কেন্দ্রে চলে আসে, বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব যখন কেন্দ্রে তখনও আশ্চর্যজনক ভাবে নারী প্রান্তিক, শুধু নারী নয় সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, মানুষ; সকলেই প্রান্তিক। কিন্তু সকলের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীতে অবস্থান করে নারী। একথা ঠিক যে, আজ এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে নারী পৌঁছয়নি, তবে তা বিশাল সংখ্যক নারীর মধ্যে ব্যতিক্রম বলেই চিহ্নিত হবে।

রামনারায়ণ বা উমেশচন্দ্রের নারীরা ছিল বাস্তবের নারী, তাই তৎকালীন সমাজ বাস্তবতায় তাদেরকে চিনে নিতে অসুবিধে হয়না। কিন্তু ক্রমশই বাস্তবের নারীরা হারিয়ে যাচ্ছে ইতিহাস আর রোমান্সের ধূপছায়ায় (মধুসূদন থেকে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ), রবীন্দ্রনাথের নারীরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যময়ী কিন্তু তারা যতখানি ভাবের বাহন ততখানি বাস্তবের নয় — রোম্যান্সের জগৎ আর ভাবের জগৎ রবীন্দ্রনাথের নাটকে মিলেমিশে একাকার। এই দীর্ঘ সময় ধরে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর আকাঙ্খিত নারীর ভাবমূর্তি নাটকে পাওয়া গেলেও সরাসরি বাস্তবের মাটি থেকে উঠে আসা নারী পাওয়া যাচ্ছে না — ফলে এক শূন্যতার, এক নৈঃশব্দের সৃষ্টি হয়েছে যা পূরণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে সমসাময়িক ইতিহাসকে অনুসরণ করে।

সমসাময়িক ইতিহাসে আবার পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে এসেছে ১৯৪৩ এর ২৪ শে অক্টোবর — শ্রীরঙ্গম রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ হয় 'নবান্ন'। এখান থেকে যে পালাবদলের সূচনা হল তাতে নাটকের কেন্দ্রে উঠে এল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। আদর্শায়িত নারীর জায়গায় এল জীবন যুদ্ধে পুরুষের সমান অংশীদার দরিদ্র নারীরা, যাদের উপর কোন চাপিয়ে দেওয়া আদর্শের ভার নেই।

এরপর বাংলা নাটকে এসেছে দেশভাগের ফল হিসেবে উদ্বাস্তু সমস্যা, লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূলের অনিশ্চিত জীবনের জন্য দায়ী কারা এ প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে এসেছে গণনাট্য সংঘ, মঞ্চস্থ হয়েছে দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক 'বাস্তুভিটা' — সমকালীন বিষয় ও রাজনীতি জায়গা করে নিচ্ছে নাটকে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশ যেদিন স্বাধীন হয়, সেদিনই শ্রীরঙ্গমে অভিনীত হয় তুলসী লাহিড়ির 'দুঃখীরইমান', নাটক অভিনয়ের আগে শিশির কুমার ভাদুড়ি বলেছিলেন — 'এই স্বাধীনতা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। অস্ত্র এখনও মাউন্ট ব্যাটেনের হাতে।' ১৯৪৮ এ পুলিশের গুলিতে কয়েকজন কৃষক নিহত হয়। স্বাধীন ভারতে গণ আন্দোলনকে স্তব্ধ করার এই প্রয়াসকে ধিক্কার জানিয়ে মঞ্চস্থ হয় অনিল বসুর নাটক 'নয়নপুর'। ১৯৪৯ এ মঞ্চস্থ হয় সলিল চৌধুরীর 'জনান্তিক' ও 'সংকেত'।[৫] এই সময় পর্যন্ত সমস্ত নাটকের বিষয় ছিল সমসাময়িক রাজনীতি। যেহেতু বাইরের জগতে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য তাই নাটকেও তার প্রতিফলন লক্ষ করা যাচ্ছে। নাটক এখন সংগ্রামের হাতিয়ার।

কিন্তু শুধুমাত্র সংগ্রামের হাতিয়ার হওয়াটাই নাটকের ভবিতব্য এমনটা মেনে নিতে পারলেন না অনেকেই। ১৯৪৮ এ 'ভালনাটক ভালভাবে করবো' এই কথা বলে শম্ভু মিত্র প্রতিষ্ঠা করেন 'বহুরূপী'। শুধুমাত্র বাস্তব প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে নয়, নান্দনিক চাহিদা পূরণের শর্তে শুরু হয় নাটক। রবীন্দ্রনাথ কে মঞ্চে নতুন করে আবিষ্কার করে বহুরূপী। দেশের বাইরেও হাত বাড়ায় নাটকের প্রয়োজনে, হেনরিক ইবসেন, ইউজিন ওনিল, আন্তন চেকভ, সোফোক্লিস, প্রমুখর নাটক রূপান্তরিত হয় বাংলায়।

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নান্দীকার'। এই সময় রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্রতর হয়, আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে থিয়েটারে। অব্যবসায়িক এবং রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে হাজির হয় গ্রুপ থিয়েটার। থিয়েটার নিয়ে শুরু হয় নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা। মৌলিক ও রূপান্তরিত উভয় ধরণের নাটকই মঞ্চস্থ হতে থাকে। উচ্চমানের প্রগতিশীল নাটকের জোয়ার আসে এই সময়, যদিও গণনাট্য আন্দোলন নাটককে যে রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল আন্তর্জাতিক নানা ঘটনাবলীর প্রভাবে তাতে ভাটার টান শুরু হয় — সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে, সাম্রাজ্যবাদী ও দেশের কায়েমী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, স্বাভাবিক কারণেই বিপ্লবী আবেগ স্তিমিত হয়। এই সময় কিছু নাট্যশিল্পী 'আর আন্দোলন নয়, শিল্পের জন্য কিছু করা দরকার', এই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়, নাটক নির্বাচনেও তার প্রভাব পড়ে। ১৯৬১ সালে আন্তন চেকভের 'দ্য ম্যারেজ প্রপোজাল' অবলম্বনে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ 'প্রস্তাব' মঞ্চস্থ হয়, লঘুচিত্তের এই নাটকটি দর্শক চিত্ত জয় করে। এছাড়া পিরানদেল্লোর 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র', চেকভের 'দ্য চেরি অর্চাড' ইত্যাদি নাটকে সমকালীন প্রসঙ্গ বা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের কোন প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়নি।[৬] ষাটের দশকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক অবস্থা উত্তাল হলেও উৎপল দত্ত ছাড়া অন্যদের নাটকে তার প্রতিফলন সেভাবে চোখে পড়ছেনা। যদিও গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কদের অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন, সেখান থেকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন দেশের চেতনাকে। ইতিমধ্যে দেশের মানুষ জার্মান

নাট্যকার ব্রের্টোল্ট ব্রেখ্‌টকে গ্রহণ করেছে । সত্তরের দশকে যা পরিণতি লাভ করে। এই সময়ে আমাদের দেশে আধাফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস, জরুরী অবস্থা, শিল্প চর্চার উপর স্বৈরশক্তির আঘাত — সমস্ত কিছু মিলিয়ে এক সংকট এবং তার বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ দানা বাঁধছিল — এই সমস্ত কিছুরই প্রকাশ ঘটলো ব্রেখ্‌টের নাটকে। ব্রেখ্‌টের নাটক বৃহৎ অর্থে মূলত রাজনৈতিক। সমাজের বহু সমস্যাকে নগ্নরূপে ব্রেখ্‌ট্ তুলে ধরেছেন এবং বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্নিহিত রাজনীতিকে সুস্পষ্ট করেছেন। এই সময়ের নাট্য দলগুলির ব্রেখ্‌টকে গ্রহণ করার কারণ হিসেবে কুন্তল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'Theatre and politics' গ্রন্থে বলেছেন — 'Thus the main reason behind the group theatres predilection for selecting Brecht's plays is that the production technique and style of Brecht's play have sufficient Marxist orientation, sophisitication and intellectual appeal to the educated urban audience in Calcuttal and district towns of West Bengal.'[৭]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ছ'য়ের দশক পর্যন্ত বাংলা নাটককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে রাজনীতি ও নান্দনিক চেতনা। নারীভাবনা কোন ভাবেই নাটকের বিষয়বস্তু হচ্ছেনা। তার কারণ হয়তো বাস্তবের মাটিতে তার উপাদান না থাকা। যদিও বিট্রেনে ও আমেরিকায় এই সময় নারীবাদী আন্দোলন ও নারীবাদী নাট্যধারা গড়ে উঠেছে কিন্তু আমাদের দেশে সেরকম কোন প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছেনা। '৭০ এর দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মহিলা সংগঠন শক্তিশালী হলেও তাদের প্রধান লক্ষ ছিল দেশের স্বৈরতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে সরব ও সক্রিয় হওয়া, নারী অধিকারের তুলনায় সাধাণ মানুষের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সোচ্চার হওয়া তখন বাস্তবের দাবী ছিল। যদিও পশ্চিমের নারীমুক্তি আন্দোলনের চাপে১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসেবে ঘোষণা আমাদের দেশেও নারীপ্রশ্নকে আলোচনায় নিয়ে আসে। তবে শম্ভু মিত্র যখন ইব্‌সেনের পৃথিবী বিখ্যাত নাটক 'A Dolls House' অবলম্বনে 'পুতুল খেলা' মঞ্চস্থ (১৯৫৮) করেন তখন তিনি মানবিক চেতনার জায়গা থেকেই তা মঞ্চস্থ করেন, নারী চেতনার জায়গা থেকে নয় বলেই মনে হয়। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের টানাপোড়েনকে প্রকাশ করাই তার মূল লক্ষ্য ছিল। মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ বা মুক্তিই তার কাম্য ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু নাট্যকার বা পরিচালকের ইচ্ছানুসারেই তা দর্শক মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এমনটা সবসময় হয়না, সচেতন ভাবে হোক্ বা না হোক্ 'পুতুলখেলা'ই বাংলা নাট্যমঞ্চে প্রথম নারী চেতনার নাটক বলে আমরা মনে করি। যদিও তার কোন ধারাবাহিকতা লক্ষ করা গেলনা।

'৭১ এর বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় উগ্র জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ঘটে। সাধারণ মানুষের ক্রোধ ও প্রতিবাদ মূর্ত হয়ে ওঠে নাটকে (যদিও কলকাতার কিছু নাম করা নাট্যদল সমসাময়িকতাকে সম্পূর্ণ রূপে

উপেক্ষা করেছিল)। থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'রাজরক্ত', 'চাকভাঙা মধু' পি. এল. টির 'ব্যারিকেড' এবং 'দুঃস্বপ্নের নগরী' প্রশংসা পায়। 'দুঃস্বপ্নের নগরী' করতে গিয়ে কিছু সমাজবিরোধীর হাতে লাঞ্ছিতা হন শোভা সেন। তাতে অবশ্য অভিনয় বন্ধ হয়নি। মফস্বলে অনেকগুলি নাটকের দল গড়ে ওঠে, নাটকের বিষয় হয় তৎকালীন শাসক দলের বর্বরতা ও পুলিশী নির্যাতন। 'হচ্ছেটা কী'? 'লাশ বিপনী' এই সময়ের প্রয়োজনা। বীর সেনের 'তখন সে এক ইতিহাস' - এ '৭২ এর নির্বাচনী প্রহসনকে তুলে ধরা হয়েছিল। ভিন্নধারার নাটক করে জনপ্রিয়তা পাচ্ছিলেন বাদল সরকার। ১৯৭৪ সালের ২০ শে আগষ্ট পুলিশের গুলিতে মারা যান নাট্যকর্মী প্রবীর দত্ত। ১৯৭৩ - ৭৪ সালে বাংলা নাটক এক বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল, রাজনীতির বিকল্প হয়ে উঠছিল নাটক। স্বাভাবিক ভাবেই 'নারী' প্রশ্নটি জ্বলন্ত সমস্যা হিসেবে কোন নাটকেই জায়গা করে নিতে পারেনি। তবু নারী সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী, নারীর নিজের ভাবনা এবং সামাজিক অবস্থানকে বুঝে নিতে অর্থাৎ নাটকগুলিতে লিঙ্গ সচেতনতার মাত্রা ঠিক কিরকম তা বুঝে নিতে আমরা এই সময়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাকে বেছে নিয়েছি। আমরা লক্ষ করেছি শোষক - শোষিতের সম্পর্ক নিয়ে রচিত শ্রেণী ঘৃণার নাটকে (চাক ভাঙা মধু)-ও নারীর স্বাতন্ত্র্য, পুরুষের তুলনায় তার প্রতিবাদের ভিন্ন ধরণ, লিঙ্গ-পীড়ণ। নিজের পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে বাদামীর (চাক ভাঙা মধু) অভিঘাতে ফুটে ওঠে স্বশ্রেণীর মধ্যেকার লিঙ্গ ভিত্তিক শোষণের ছবি। অন্য দিকে অঘোর দাস শোষকরূপে, তার অর্থনৈতিক শোষণের চেহারা পুরুষদের কাছে পরিচিত হলেও বাদামীর সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগযোগ না থাকার ফলে সেই শোষণ বাদামীর কাছে অপরিচিত ছিল, তাই প্রাণরক্ষা করার আদিম নারী প্রবৃত্তিতে এগিয়ে গেছে সে, পরিবারের অনিচ্ছাকে তুচ্ছ করে, জটা বাধা দিতে এলে বাঁশ নিয়ে তাকে তেড়ে মারতে গেছে কিন্তু সেই অঘোর দাস বেঁচে উঠে যখন তার দিকে লালসার থাবা বাড়ায় তখন সে তার স্বশ্রেণীর পুরুষদের থেকেও সাহসী হয়ে ওঠে। তার এই তীব্র ঘৃণা অর্থনৈতিক শোষকের বিরুদ্ধে শুধু নয় শোষক পুরুষের বিরুদ্ধেও। এখানে বাদামী শ্রেণীগত দিক দিয়ে শোষিত তো বটেই, তার উপরে নারী হিসেবে আবার শোষিত।

নাট্যকার নিজে নারীর এই দ্বিমাত্রিক শোষণ সম্পর্কে অবহিত, বাদামী সচেতন কিনা বোঝা যায়না কিন্তু তার সক্রিয় প্রতিবাদে একথা স্পষ্ট হয় যে নারী আর অবলা নয়, প্রথম পর্বের নাটকের নারীদের তুলনায় তার সামাজিক অবস্থান ও চৈতন্যের পরিবর্তন ঘটেছে।

এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে টিনের তলোয়ারের ময়না ও আঙুরের মধ্যে। ময়নার প্রতি যে অন্যায় ও অবিচার কাপ্তেন করে, তার অন্যথা ঘটানো তাদের সাধ্যের অতীত হলেও, তারা কিন্তু তা মুখ বুজে সহ্য করেনা — নিজেদের মত করে তার প্রতিবাদ করে, ময়নাকে বীরকৃষ্ণের হাতে তুলে দেবার পর আঙুর জানায়, পেটের দায়ে সে বাবুর কছে কাজ করবে বটে কিন্তু শ্রদ্ধা করতে পারবেনা আর কখনো।

'জগন্নাথ' নাটকেও শ্রেণী দ্বন্দ্বের পাশাপাশি লিঙ্গ বৈষম্যের পরিচয়টিও পরিস্ফুট হয়েছে। শ্রেণী

নির্বিশেষে নারীরা কিভাবে পীড়নের শিকার হয়, তা এই নাটকেও লক্ষ করা যাচ্ছে।

এই দশকের প্রযোজনার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 'অপরাজিতা', কারণ নাটকটির কেন্দ্রবিন্দুতে আছে একজন নারী, তার দৃষ্টিতেই সমগ্র ঘটনা উপস্থাপিত ও পর্যালোচিত হয়েছে। অপরাজিতা অন্যাসক্ত স্বামীকে মেনে নিতে পারেনি। খাওয়া পাবার নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে অনিশ্চিতের পথে — রামনারায়ণের নায়িকাদের মত নির্বিবাদে সপত্নীকে মেনে নেয়নি — একশ বছরে এই পরিবর্তনটুকু মেয়েদের হয়েছে, সে নিজেকে একজন ব্যক্তি হিসেবে ভাবতে পারে, একান্তভাবেই নিজের কথা বলে, প্রত্যেক মানুষের— হ্যাঁ একজন নারীরও যে কিছু বলার থাকতে পারে, একথা সে উপলব্ধি করে ('আমার কথা তো আমারই হবে, সবটাই আমার। কিন্তু নিজের কথা বলতে গেলে নিজের একটা জায়গা দরকার — একটা আশ্রয়।') এবং সমস্ত মঞ্চ জুড়ে সে নিজের কথাটাই বলে, নিজের যন্ত্রনার কথা, ভালবাসার কথা ও অসহয়তার কথা। সে বোঝে তার নিজের কথা বলতে গেলে একটা চাকরী দরকার — অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যে নারী মুক্তির প্রাথমিক শর্ত সে কথা সে বোঝে। সুতরাং একে আমরা নারীর মানসিক উত্তরণ বলেই চিহ্নিত করবো। যদিও শেষ পর্যন্ত অপরাজিতাকে মেট্রোর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। অপরাজিতার এই অসহায়তাকে মেনে নিতে পারেননি অনেকে, প্রশ্ন তুলেছেন পরিচালক তৃপ্তি মিত্র কেন আরেকটু সাহসী হলেন না। কেন তিনি অপরাজিতাকে আত্মপরিচয় লাভের জন্য উৎসাহিত করলেন না? কেন মেয়েদের শুধু মেট্রোর সামনেই দাঁড়াতেই হয়?[৮] পরিচালক হয়তো কিছুটা সাহসী হতে পারতেন কিন্তু তাতে তাকে বাস্তবতাকে অতিক্রম করতে হত। এই সময় পর্যন্ত মেয়েরা পুরুষ নির্ভরতাকে অতিক্রম করতে পারেনি — এটাই ছিল তখনকার সমাজ বাস্তবতা।

বহুরূপীর 'যদি আর একবার' নাটকেও নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও একক জীবন যাপনের প্রশ্নকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। অবিবাহিতা চাকুরীজীবী বনলতাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কোন বাড়তি সম্মান এনে দেয়নি, করে তুলেছে বিপজ্জনক, অতি আধুনিকা। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ নিঃসঙ্গতা — এমন একটি ইঙ্গিত এই নাটকে আছে।

'অপরাজিতা'-য় নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে একজন নারী, পরের নাটকে সেই স্বাধীনতাকে সমাজ কি ভাবে দেখছে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখান থেকে একথা স্পষ্ট যে মধ্যবিত্ত সমাজে এই দুই ভাবনার বৈপরীত্য বিদ্যমান ছিল। যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ নারীকে একদিন অন্তঃপুর থেকে বাইরে নিয়ে এসেছিল, শিক্ষার আলো দেখিয়েছিল, তারা নারীকে করুণা করতে চেয়েছিল — স্বভাবিক ভাবেই নারীরা যখন আর করুণার পাত্রী থাকতে রাজী হয়নি, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছে স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত

পুরুষ সমাজ বেঁকে বসেছে, নানা ভাবে তাকে পিছনে টানতে শুরু করেছে। ধর্মের নামে পারিবারিক সম্মান ও ঐতিহ্যের নামে, মাতৃত্বের নামে এবং সর্বোপরি ভালবাসার নামে তাকে বাঁধতে চেয়েছে — তারই বিভিন্ন প্রকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই সময়ের বিভিন্ন নাট্য প্রযোজনায়।

এই দশকের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলিতে নারীর সামাজিক অবস্থান, মানসিক পরিবর্তন নারী সম্পর্কে তার নিজের এবং নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ লিঙ্গ সচেতনতা ও লিঙ্গ বৈষম্যের চিত্র সর্বত্র সমান নয়। শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং শ্রেণী সংগ্রাম এবং সমসাময়িক রাজনীতিই এই সময়ের বেশীর ভাগ নাটকের বিষয়বস্তু। এছাড়া কিছু ধ্রুপদী নাটকের চর্চাও এসময় হচ্ছে, সচেতন ভাবে 'নারী' কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসেনি কিন্তু তবুও লক্ষ করলে দেখা যাচ্ছে সমাজের অর্ধেক অংশ নারীকে একেবারে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না, অসচেতন সৃষ্টি বলেই হয়তো নারীর মোটামুটি যথাযথ রূপায়ণই করা হয়েছে, তাকে অকারণে মহিমান্বিত বা কলঙ্কিত করা হয়নি। কিন্তু সবসময় নারীকে দেখা হচ্ছে পুরুষের সাপেক্ষে, সমস্ত নাটকেই সে 'অপর'।

'৭৭ এ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়। সাংস্কৃতিক মুক্ত চিন্তায় সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। রাজনৈতিক অস্থিরতার ক্রমাবসান ঘটে। নাটকেও স্বস্তির ছাপ পড়ে। রাজনৈতিক নাটকের জায়গা দখল করতে থাকে পারিবারিক ও সম্পর্কের জটিলতার নাটক। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা গুলি হল — শূদ্রক প্রযোজিত দেবাশিষ মজুমদারের 'অমিতাক্ষর', সুন্দরম এর প্রযোজনা মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান' এছাড়া 'মেষ ও রাক্ষশ', 'শোভাযাত্রা', 'পদ্মানদীর মাঝি' (লাইম লাইট প্রযোজিত), বহুরূপীর, 'মৃচ্ছকটিক', অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাপপুণ্য', এছাড়া 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী', 'নাথবতী অনাথবৎ' 'গ্যালিলিওর জীবন' ইত্যাদি। সাত ও আটের দশকের নাট্যজগৎ অনেকটা অধিকার করেছিলেন ব্রেখট। থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে', উৎপল দত্তের অন্য একটি ব্রেখ্‌ট রূপান্তর 'সমাধান' মঞ্চায়িত হয় মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনা ও প্রযোজনায়। সংলাপ কলকাতার 'বিধি ও ব্যতিক্রম' (ব্রেখ্‌ট অবলম্বনে কুন্তল মুখোপাধ্যায়ের রূপান্তর) এই সময়ের প্রযোজনা।

নাটক নির্বাচনে বিষয়ের বৈচিত্র্য এসময় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে লিঙ্গ সচেতনতা সর্বত্র লক্ষ করা যাচ্ছেনা — সেদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য 'পদ্মানদীর মাঝি', 'মৃচ্ছকটিক', 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' এবং 'নাথবতী অনাথবৎ'।

মনে রাখতে হবে আশির দশকের আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে নারী মুক্তি আন্দোলন সেই অর্থে না হলেও এই সময় নারী মুক্তির প্রশ্নে প্রতিবাদ প্রতিরোধের মিছিল, পোষ্টার, প্যাম্পলেট,গান, নাটক প্রকাশিত হতে থাকে। '৮৩ তে মালিনী ভট্টাচার্যের নাটিকা 'মেয়ে দিলে সাজিয়ে' প্রকাশিত হয়। পণপ্রথা বিরোধী

নাটক। এই নাটকটি লেখার কৈফিয়ৎ হিসেবে নাট্যকার বলেছেন — " ... নাটক লেখার জন্য নাটক ছাড়াও শিল্প বর্হিভূত অন্য তাগিদ ছিল। সচেতনা নামে একটি ছোট্ট নারী সংগঠনের আমি সদস্য। এদের প্রধান কাজ নারী মুক্তির প্রশ্নগুলি দিয়ে চেতনা জাগানোর উদ্দেশ্যে নানা ধরণের প্রচার কাজকর্ম করা। একটি মাসিক আলোচনা চক্রও চালানো হয়। পণপ্রথার উপর এই ধরণের একটি আলোচনা চক্র হয়েছিল, যার ফলে আমরা সকলেই ব্যাপারটা গুরুত্ব বুঝতে পারি এবং ঠিক করি পণপ্রথার অভিশাপকে আক্রমণ করে কিছু প্রচার মূলক কাজ করা হবে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই আমি নাটক লিখে তা বিভিন্ন জায়গায় করাবার ভার নিই। ..."[৯]

নারীমুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা জাগানোর স্পষ্ট লক্ষেই এ নাটক রচিত হয়েছে সে দিক দিয়ে এই নাটকটি আমাদের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই সময়ে নাটকে একটা নতুন ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হল পুরাণের পূনর্মূল্যায়ণ। বুদ্ধদেব বসু লিখছেন 'প্রথম পার্থ', 'অনাম্নী অঙ্গনা', 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী', শাঁওলী মিত্র লিখছেন 'নাথবতী অনাথবৎ'। এই শতকের ষাটের দশক থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছিল। নারীবাদীরা বদলে দিচ্ছিলেন সাহিত্য মূল্যায়ণের প্রথাগত রীতি, কেট মিলেট বিভিন্ন সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণে লিঙ্গরাজনীতির স্বরূপ উদঘাটিত করেন। লিলিয়ান রবিনসন (১৯৮০) নারীবাদী সমালোচনার দুটি লক্ষ স্থির করেন (১) নতুন ভাবে পড়তে হবে সমগ্র ঐতিহ্যকে, পুনর্ব্যাখ্যা করতে হবে নারী চরিত্রগুলি, শণাক্ত করতে হবে লিঙ্গ বাদী ভাবাদর্শ এবং তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। (২) যে লেখিকারা উপেক্ষা কিংবা বিস্মৃতির অন্ধকারে চলে গেছেন, তাদের খুঁজে বার করতে হবে এবং সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বুদ্ধদেব বসু বা শাঁওলি মিত্রের নাটকেও এই প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্বের আলোতে 'নাথবতী অনাথবৎ' বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে 'মাইলষ্টোন' বলা যেতে পারে, যদিও বাংলা কাব্যে একাজের শুরু অনেক আগেই করে গেছেন মধুসূদন। এই দশকে বহুমাত্রিক নারী চরিত্রের দেখা পাওয়া না গেলেও, নারী সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা বদল লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যদিও নারী এখনও পুরুষ নির্ভরতা অতিক্রম করতে পারছে না তবু নারীকে নতুন ভাবে আবিষ্কারের, তাকে গুরুত্বহীনতার অন্ধকার থেকে বের করে আনার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে — সেই সদর্থক ভূমিকাকে আমরা হিসেবের মধ্যে রাখতে চাই।

(৮৭ - ৯৭) এই দশকের পশ্চিমবঙ্গ সম্পূর্ণ নিস্তরঙ্গ। নিরাপত্তার নিশ্চিদ্র ঘেরাটোপে বন্দী আত্মকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত। বিশ্বায়নের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে শিল্প - সংস্কৃতি, ব্যবসা - বাণিজ্য, কৃষি ও বিপণনে, প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে ছাত্ররা সমাজবিমুখ। নাটকেও এর ছাপ স্পষ্ট। নাটকে বিষয়ের

অভাব। মধ্যবিত্ত সমাজের মানবিক সম্পর্কের জটিলতাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাটকের বিষয়। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলি হল — মাধব মালঞ্চী কইন্যা, দায়বদ্ধ, বাসভূমি, কর্ণাবতী, আক্রমন, গন্তব্য, নীলাম নীলাম, মুষ্টি যোগ, তখন বিকেল, জন্মদিন, অলকানন্দার পুত্রকন্যা, দর্পনে শরৎশশী, খেলাঘর, রস, অশালীন, ফেরিওয়ালার মৃত্যু, নগর কীর্তন, গোত্রহীন, যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল ইত্যাদি।

নাটক তার রাজনৈতিক ধার হারিয়ে মূলতঃ বিনোদনের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। বিভাস চক্রবর্তীর মত রাজনীতি সচেতন নাট্যপরিচালক মঞ্চস্থ করলেন — ময়মন সিংহ গীতিকা অবলম্বনে 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' — সম্পূর্ণ রূপকথা। যদিও এর কৈফিয়তে বিভাস চক্রবর্তী বলেছেন যে ওর (নাটকের) মধ্যে যে নিখাদ বাঙালিয়ানা আছে তাই তাকে প্রধানত আকৃষ্ট করেছিল। বাংলার লোকনাট্যের রীতি, লোকভাষা, লোকজীবনকে তুলে ধরতে চেয়েছেন নাটকটির মধ্যে দিয়ে। তাছাড়া ' ... আমাদের দেশে যত লোকসাহিত্য আছে ময়মন সিংহ গীতিকা সবচেয়ে প্রগতীশীল সাহিত্য রীতি। কারণ প্রধানত নারী প্রধান, ঐ তিনশ বছর আগেও নারীকে যেভাবে দেখা হচ্ছে, যে মুক্ত ভাবে, তার সেই লড়াই এর ক্ষমতা সে মুক্তি এখনো নারী পায়নি।' অর্থাৎ এই নাটকটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীমুক্তির ভাবনা কাজ করেছে এটা অন্ততঃ নাট্যপরিচালকের অভিমত। তবে যেহেতু বাস্তবের নারী সমস্যার সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত করা যায়না এই নাটককে সেজন্য আমরা নার্টকটিকে আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করিনি।

এই দশকে 'সায়ক' নাটগোষ্ঠী অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এরা গ্রুপ থিয়েটারের ভাবনায়, বিশেষত মঞ্চভাবনায় বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। মঞ্চে দোতলা বাড়ী, উট এসবও নিয়ে এসেছেন পরিচালক, নাটককে 'রিয়ালিষ্টিক' করতে যা কিছুর প্রয়োজন, নির্দ্বিধায় করেছেন। নাটকের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার না করলেও বিনোদনকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। তাদের প্রযোজনাগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায় নারী সম্পর্কিত ভাবনায় তারা সচেতন। 'দায়বদ্ধ' নাটকটি 'সায়ক' গোষ্ঠীকে অসম্ভব জনপ্রিয়তা এনে দেয়। মানবিক আবেদনের গল্প এটি। নাটকের মুখ্য নারীচরিত্রটি নিজের স্বামীকে ছেড়ে ঘটনাচক্রে এক ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে বাস করলেও মধ্যবিত্ত নারীর কোন সংস্কারই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ভালবাসা ও আশঙ্কার দোলাচলে সে দুলতে থেকেছে হয়ে উঠেছে রুক্ষ, স্বার্থপর ও অমানবিক। যদিও শেষ পর্যন্ত সে ট্রাক ড্রাইভারের মানবিকতা ও ভালবাসাকে উপেক্ষা করতে পারেনি। নারী চেতনার দৃষ্টিতে সে অত্যন্ত স্বার্থপর।

'বাসভূমি'তে কিন্তু 'সায়ক' প্রতিস্পর্ধী। একজন ধর্ষিতা মেয়েকে কেন্দ্রে রেখে নাটকটি রচিত হয়েছে, যে ঘটনার ফলশ্রুতিতে তাকে যৌনকর্মী হয়ে যেতে হয়। এই মেয়েটি (হৈমন্তী) তার এই অবস্থার জন্য তার বাবা মাকে দায়ী করেছে। নারী ও পুরুষের জন্য সমাজের যে দ্বৈত মান (double standard)

তাকে চমৎকার ভাবে উন্মোচিত করা হয়েছে এই নাটকে। নারী মুক্তির কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেছে এই নাটক।

নব্বই এর দশকে যখন হৈমন্তী বা জয়ীর মত চরিত্র অঙ্কিত হচ্ছে তখন বাস্তবে ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে নারীর অবস্থা সামাজিক ভাবে উন্নত হয়েছে। শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে, বেড়েছে চাকুরীরতা মহিলার সংখ্যা, বিয়ের বয়স বেড়েছে, পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে বৈষম্য মধ্য ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে কমেছে। কিন্তু অদ্ভুত ভাবে এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে পণের দাবী, পণের দাবী মেটাতে না পারার জন্য হত্যা, কন্যাভ্রূণ হত্যা, নারীর প্রতি সমাজের ঐতিহ্যবাদী চাহিদা — ফলে অদ্ভুত এক জগাখিচুড়ি চাহিদা তৈরী হয়েছে মেয়েদেরকে ঘিরে। তাদেরকে লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে, সর্বোচ্চ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আশা করা হচ্ছে তারা সর্বোপরি হবে একজন 'সুমাতা' ও 'সুগৃহিনী'। কখনো কখনো বা দুটোই চাওয়া হচ্ছে — এমনই এক 'সুপারমম' এর দেখা পাই আমরা মনোজ মিত্রের 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'য়। যে মনোজ মিত্র বাদামীর মতো চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তিনি এই সময় অলকানন্দা ও দেবাহুতির মতো চরিত্রও সৃষ্টি করেছেন। অলকানন্দা মমতাময়ী মা, দায়িত্বশীলা স্ত্রী, সুগৃহিণী এবং এত কিছুর বাইরে চাকরী করে অর্থাৎ নারীর প্রতি পরিবারের ও সমাজের যে ক্রমবর্ধমান দাবী তাকে পূর্ণরূপে চরিতার্থ করে এই চরিত্রটি। সামাজিক উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেও সে সম্পূর্ণ রূপেই 'ঘরোয়া দাসী'র ভূমিকা পালনে পারঙ্গম।

যতদিন পর্যন্ত মেয়েরা বাইরের কাজে অংশগ্রহণ করেনি ততদিন তাদের শুধু ঘরের কাজই করতে হত কিন্তু বর্তমানে ঘর ও বাইরে উভয় দিককেই সামাল দিতে হয়। আজকের নারীর কাছে সমাজের চাহিদায় অদ্ভুত বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে — একদিকে এই মেয়েরা হবে সুন্দরী, শিক্ষিতা, স্মার্ট, চাকুরীরতা ও আধুনিকা, অন্যদিকে সে হবে ঘোর সংসারী অর্থাৎ বাইরের কাজের জগৎ যতই বিস্তৃত হোক্ তার মস্তিষ্ক জুড়ে থাকবে সংসার-সন্তান-স্বামী। সে স্বামীর ফাইল এবং বাচ্চার টিফিন বাক্স একসঙ্গে গুছিয়ে দিয়ে কোন রকমে ছুটবে বাইরের কাজে। এই চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও সবসময় পেরে উঠছেনা মেয়েরা, তখন তাদের বিভিন্ন ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে — মাতৃত্বের মহিমা, সুগৃহিনীর তক্‌মা বা দশভূজার উপমায় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলা হচ্ছে। অলকানন্দা এমনই এক মা। কিন্তু সব মেয়েরাই এরকম নয়, যারা এই দর্শনে আত্মস্থ নয় তারা নাটকে অঙ্কিত হচ্ছে উচ্ছৃঙ্খল ও অসামাজিক রূপে, যেমন এই নাটকে করা হয়েছে দেবাহুতিকে। উচ্ছৃঙ্খলতা ও নারীমুক্তিকে সমার্থক করে ফেলা হচ্ছে ইচ্ছাকৃত ভাবেই।

কিন্তু এই দুই বিপরীত মেরুর বাইরেও কিছু মেয়ে আছে স্বাধীন - স্বনির্ভর, নিজের মত করে জীবন ও জগৎকে দেখতে চায়। স্বামীর বিপুল বৈভবে গর্বিত না হয়ে নিজের সামান্য স্বাধীন উপার্জনের উপায়কে প্রাণপণে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, বাবা-মা - ভাই-বোনের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে চায়, আত্মমর্যাদা রক্ষিত না হলে 'সুখের সংসার' ছেড়ে বেরিয়ে আসতেও কুণ্ঠাবোধ করেনা। 'অন্ধগলি'র নীলাঞ্জনা এই জাতের মেয়ে যে অসুস্থ মা আর বোবা ভাইয়ের মুখে খাবার তুলে দিতে এমন কাজ করতে বাধ্য হয়েছে যা পরবর্তীতে তার বিবাহিত জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে, তবু সে মর্যাদা বির্সজন দিয়ে আত্মসমর্পন করেনি। বাংলা নাটকে এরকম ব্যাতিক্রমী, স্বাধীন, প্রতিবাদী মেয়ের দেখা আমরা কমই পেয়েছি, বিশেষত মধ্যবিত্ত পরিবারে।

তবে ব্যতিক্রমী বা প্রতিবাদী মেয়ে যে একবারে দেখা যাচ্ছেনা তা নয়। কিন্তু হয় যেই নারী অন্ত্যজ শ্রেণীর (বাদামী), নয় তাদের নিয়ে আসা হচ্ছে কিংবা স্থাপিত করা হচ্ছে রূপকথার রাজ্যে। তা নইলে 'কর্ণাবতী' কিংবা 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'য় যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। মালঞ্চী সমস্ত সামাজিক বাধাকে অতিক্রম করে পুরুষ বেশে মাধবকে উদ্ধার করে।

কর্ণবতী'র মল্লি চরিত্র বাস্তবের মাটিতে প্রোথিতা হলেও কুসুম্বীকে তা করা হয়নি। ফলে তার মধ্যেকার মনের জোর যা তাকে সমাজনীতি অগ্রাহ্য করে, স্বামীকে ত্যাগ করে, প্রেমিকের হাত ধরে বেরিয়ে যেতে সাহস জুগিয়েছে, আবার প্রবঞ্চক বুঝতে পেরে তাকে প্রত্যাখান করিয়েছে — তাকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না মোটেই, তাই তার লড়াই এর সঙ্গে আজকের নারী সাজুয্য বোধ করেনা।

'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' থেকেই মনোজ মিত্র তার পথ পরিবর্তন করেছেন। রূপকথা না হলেও ইতিহাসের ছায়াচ্ছন্ন পথ তাকে হাতছানি দিয়েছে, 'গল্প হেকিম সাহেব', 'ছায়ার প্রাসাদ' তার উদাহরণ। রাজনীতির দেখা আগের দশকের নাটকেই সেভাবে পাওয়া যায়নি, এই দশকের নাটকে সমসাময়িক সামাজিক সংকটও অনুপস্থিত। গল্পের যে নিটোলবৃত্তকে ভেঙে প্রান্তিক একদল মানুষকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, নবান্নের সেই ব্যতিক্রমী পথ আজ রুদ্ধ। গল্প বলার ঝোঁক বেড়েছে, মঞ্চ জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মধ্যবিত্ত 'পরিশীলিত' (sophisticated) মানুষ। হয়তো প্রসেনিয়ম থিয়েটারের দর্শকের কথা ভেবেই তাদের এই প্রত্যাবর্তন। তবে নাটকের এই বন্ধ্যাত্বের কারণ খুঁজতে হবে বাস্তবের মাটিতে।

অর্থনৈতিক সমস্যা ঘনীভূত হলে মানুষের জীবনে যে সংকট ঘনিয়ে আসে তা তাকে গতানুগতিক

জীবন ছেড়ে প্রতিবাদের পথে নেমে আসতে বাধ্য করে। এই নেমে আসতে গিয়ে প্রতি পদে তার গতিরোধ করে প্রতিক্রিয়ার দর্শন — তার বিরুদ্ধে লড়াই করেই তাকে এগুতে হয়। বাস্তব অবস্থা তাকে পশ্চাদমুখী দর্শনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী করে তোলে, এটা একটা সামাজিক চেহারা যখন নেয়, তখনই বড় আকারে সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন মাথা তোলে, পশ্চাদমুখী দর্শন পিছু হটতে থাকে— একসময় যা পশ্চিমবঙ্গ কে তোলপাড় করেছিল, নাটকে তার প্রভাবও আমরা লক্ষ করেছি।

কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক সমস্যা বেড়ে গেলেও আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এল এবং পশ্চাদমুখী ভাবনারও অভ্যুত্থান ঘটতে থাকলো। এর কারণ সত্তরের দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দা পুঁজি কাটিয়ে উঠতে পারলো আশির দশক থেকেই, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের মধ্যে দিয়ে। একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্যের বৃদ্ধি বিশ্ব জুড়ে শ্রমিক শ্রেণীর দরকষাকষির ক্ষমতা কেড়ে নিল, ফলে লড়াই আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়লো। তবু মানুষ প্রাণের তাগিদে অধিকারের লড়াই চালিয়ে যায়, যদিনা অন্য কোন মতাদর্শ তার গতিরোধ করে — পশ্চিমবঙ্গে ঠিক তাই হল। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখাকে প্রাথমিক গুরুত্ব দিলেন, শিল্পে শান্তি রক্ষা জরুরী হয়ে দাঁড়াল, শিল্প-বান্ধব হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। ফলে যে শ্রমিক কৃষকের আপনজন ছিলেন এঁরা, তারাই যখন শ্রমিক কৃষককে শান্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করতে লাগলেন, স্বভাবতই আন্দোলন স্তিমিত হল। সমস্ত রকম অগণতান্ত্রিক ও পশ্চাদ্‌পদ ধারণা মাথা তুললো। তাছাড়া বিশ্বায়ন একদিকে আশি ভাগ মানুষকে নিংড়ে নিয়ে কুড়ি ভাগের জন্য যে স্বচ্ছলতা সমৃদ্ধি এনে দিল, পাশাপাশি হাজির করলো ভেগের তাক লাগানো অজস্র উপকরণ, তাতে শ্রমিক কর্মচারীদের উচ্চতর অংশটি সহ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভোগবাদের মতাদর্শে আচ্ছন্ন হল — বুদ্ধিজীবীরাও তার বাইরে থাকলোনা। ফলে সৃষ্টিশীলতার জগতে একধরণের বন্ধ্যাত্ব দেখা দিল। এই অবস্থায় রাজনীতি বিমুখ, বিদ্রোহ বিমুখ হয়ে পড়লো নাটক এবং তার দর্শক।

এই দশকের একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'রস'। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প অবলম্বনে অম্বর রায়ের নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় 'সমকালীন শিল্পীদল' এটি মঞ্চস্থ করে। নাটকটি নানা দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, আমাদের আলোচ্য আর কোন নাটকে মুসলিম পরিবারের ছবি পাওয়া যায়নি, অথচ বাঙালী সমাজের অনেকটা জুড়ে আছে এই পশ্চাদপদ মুসলিম জনগোষ্ঠী। পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের আরো পিছিয়ে পড়া অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশে বাস করা মুসলিম নারীরা, যার অন্যতম কারণ নানাধর্মীয় বিধি নিষেধ। ধর্মীয় আবরণ কি ভাবে নারী শোষণে সাহায্য করে তা দেখানো হয়েছে নাটকে, তাছাড়া ধর্ম-বর্ণ-দেশ-জাতি নির্বিশেষে নারীরা যুগ যুগ ধরে কী ভাবে পুরুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে তা এখানে দেখানো হয়েছে এবং সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

'তালাক', এক স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করার অধিকার খোরপোষ পাবার অনধিকার ইত্যাদি ধর্মীয় খাঁড়া সবসময় ঝুলতে থাকে মুসলিম নারীর উপর। আলোচ্য নাটকে তালাক একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হিসেবে এসেছে, একজন নারীর জীবনে এই শব্দটি যে কী ভয়ংকর ভাবে নেমে আসতে পারে, মাজুর জীবনে তা প্রত্যক্ষ করা গেছে। এই মেয়েটি শ্রেণী - ধর্ম - এবং লিঙ্গ তিন দিক দিয়েই শোষিত। স্বামী তাকে সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। নারীকে যৌন সামগ্রী এবং ব্যবহার্য বস্তুতে পরিণত করার মানসিকতাকে প্রশ্ন করা হয়েছে এই নাটকে এবং শেষ পর্যন্ত মোতিকে মাজু বিবির কাছে ফিরে আসতে বাধ্য করে নাট্যকার সদর্থক ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। 'তালাক' শব্দটি মুসলিম নারীর কাছে যে কি ভয়ংকর শব্দ তা আসামের 'যাত্রা' নাটকে (২০০২ সালে নান্দীকার আয়োজিত নারী নাট্য মেলায় অভিনীত) খুব সুন্দর ভাবে উঠে এসেছে। রাবেয়া নামের একটি মেয়ের স্বামী তাকে তালাক দিয়ে তার মেয়ের বয়সী একজনকে বিয়ে করে, পরে মেয়েটি যখন তাকে ছেড়ে চলে যায় তখন তার প্রাক্তন স্বামী পুনরায় তাকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু ধর্মে এই বিবাহের শর্ত হচ্ছে মেয়েটিকে বিয়ের আগে অন্য আরেকজনের সঙ্গে এক রাত কাটাতে হবে এবং তার কাছে তালাক নিয়ে তবেই প্রথম স্বামীর সঙ্গে পুনর্বিবাহ হতে পারবে। মৌলবী যখন শরিয়তের এই নিয়মের কথা শোনায় তখন তার স্বামীর স্পর্ধায় ক্রুদ্ধ রাবেয়া তার স্বামীকে সপাটে এক চড় কষায়। এই চড় নারী শোষণের বিরুদ্ধে এক সশব্দ প্রতিবাদ হিসেবেই নাটকে প্রতিধ্বনিত হয়। ধর্মের নামে নারীর উপর যে জুলুম ও পীড়ণ করা হয় তার বিরুদ্ধে এক স্পষ্ট প্রতিবাদ এই নাটকটি।

একবিংশ শতাব্দীর দোড়গোড়াতে দাঁড়িয়েও মেয়েরা যে কত অসহায় তাই প্রত্যক্ষ করা যায় জয় গোস্বামীর 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' কাব্য নাট্যে। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের পিতৃহীন মেয়েটিকে বাধ্য হতে হয় পড়াশুনা শেষ করে চাকরী করার ইচ্ছেটাকে টুটি টিপে মেরে, বিয়ের পিঁড়িতে বসতে। বিবাহিতা জীবনে শাশুড়ির ফরমাস আর স্বামীর যৌনচাহিদা পুরণ করে মানিয়ে নেবার প্রচণ্ড চেষ্টা করতে করতে শেষ পর্যন্ত স্বামীর প্রেমিকার সংবাদে ঘর ছাড়ে, নতুন করে বাঁচার প্রেরণায় হাত ধরে এক স্বাধীন স্বনির্ভর বান্ধবীর। যদিও নাটকের শেষে দেখা হয়েছে তার প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে — একে অনেকেই পুরুষ নির্ভরতা অতিক্রম না করতে পারা বলেছেন, কিন্তু আমরা মনে করি এই মেয়েটি তার জীবনের সমস্যার একটা আপাত সমাধান খুঁজে পেয়েছে বন্ধুটির আর্থিক স্বনির্ভরতা ও একক জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে। এই জীবনের আশ্বাস ও বন্ধুত্বের আশ্রয় তাকে ঘর ছাড়তে সাহস জুগিয়েছে। মেয়েটির চোখ দিয়েই সমস্ত ঘটনা দেখা হয়েছে, ফলে উঠে এসেছে জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটিতে কি ভাবে জড়িয়ে থাকে নারীর প্রতি লোভ আর বঞ্চনার ইতিহাস। সে টের পায় পুরুষের লোভ, অবজ্ঞা কিভাবে তার দম বন্ধ করে দিয়েছিল — শেষ পর্যন্ত সে এই দমবন্ধকর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ জানিয়েছে, এখানেই নাটকটির সদর্থক ভূমিকা।

'শানু রায়চৌধুরী' নান্দীকার প্রযোজিত স্বাতীলেখার একক অভিনীত একটি নাটক। শানু এমন একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা, বিবাহ যার কাছে কোন সুখের বন্ধন ছিলনা, স্বামীর সঙ্গে ভালবাসার বন্ধন ছিলনা, সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান এবং সংসারকে সুপরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল। এরকম এক সংসারে, একসময়ের হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল শানুর জীবন নিমজ্জিত হয়েছিল অর্থহীন শূন্যতার অন্ধকারে। এই রকম সময় শানু আবেগ-তাড়িত হঠাৎ সিদ্ধান্তে এক নারীবাদী বন্ধুর সঙ্গে নেপাল বেড়াতে যায় — এই যাত্রাই তার আত্ম উন্মোচন ঘটায়। সে উপলব্ধি করে সে একজন স্ত্রী, একজন মা, কিন্তু সর্বোপরি সে শানু রায়চৌধুরী — এই ভাবে সে আত্মচেতনা লাভ করে। সে একথাও উপলব্ধি করে যে সত্যিকার স্বাধীনতা হল আত্মিক স্বাধীনতা যা নিজের মধ্যেই থাকে। সেই স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত বাইরের স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।[১০]

এটি আমাদের আলোচিত একমাত্র নাটক যেখানে একজন নারীর আত্মপরিচয়ের সংকট (Identity Crisis) থেকে আত্ম-উন্মোচন বা আত্মপরিচয় লাভের মধ্যে দিয়ে নারীর মানসিক স্বাধীনতার চিন্তায় উত্তরণ ঘটেছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারী স্বাধীনতার প্রাথমিক সোপান নিশ্চয়ই কিন্তু চরম লক্ষ অবশ্যই মানসিক স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতা নিজের ভেতরেই লাভ করতে হয়। এই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনা বলে আজও আর্থিক স্বনির্ভর মেয়েরা প্রয়োজনেও পুরুষ নির্ভরতা অতিক্রম করতে পারেনা। এই নাটকটিকে আমরা সম্পূর্ণ নারীমুক্তির নাটক বলতে পারি। শানু এই নাটকে নিজেকে 'অপর' (Other) এর জায়গা থেকে 'স্বয়ং' (Self) এর জায়গায় নিয়ে এসেছে।

এই দশকের নারীর যে রূপ নাটকে অঙ্কিত হয়েছে তা এক মাত্রিক নয়। কোথাও নারীর ঐতিহ্যিক রূপকে মহিমান্বিত করা হচ্ছে (অলকানন্দার পুত্রকন্যা), যেখানে সে পুরোপুরিই পুরুষের 'অপর', স্ত্রী এবং মা এর ভূমিকায় সার্থক হতে গিয়ে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে এবং সেই কারণেই যে মহিমান্বিত হয়েছে। কিন্তু এমন অনেক নাটকও পাওয়া যাচ্ছে যেগুলিতে নারী উপস্থাপিত হয়েছে স্বতন্ত্র রূপে, অপরের সঙ্গে যে কোন না কোন ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে বা করার জন্য লড়াই করছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই এর চিত্র সবচেয়ে বেশী পাওয়া যাচ্ছে 'রঙ্গকর্মী'র নাটকে।

এতাবৎকালের রঙ্গকর্মীর প্রযোজনার দিকে দৃষ্টি দিলে একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, নারী — আরো স্পষ্ট করে বললে নারীর জীবনযুদ্ধই—অধিকাংশ নাটকের মূল উপজীব্য। 'হিম্মৎমাই' থেকে শুরু করে 'রুদালী', 'মুক্তি', 'বামা', 'বেটি আয়ি', 'অন্তরযাত্রা' এমন কি একেবারে হালের 'খেলা গাড়ী' পর্যন্ত সমস্ত নাটকই নারীকেন্দ্রিক, নারীর জীবন সংগ্রামের কথা। 'বেটি আয়ি' ছাড়া নারীমুক্তির কথা কোথাও সরাসরি উচ্চারিত না হলেও যে লড়াইকে তিনি তুলে ধরেছেন তা নারীর মুক্তির পথেই যাত্রা।

যদিও 'হিম্মতমাই' একটি যুদ্ধ বিরোধী নাটক, তবে সেই যুদ্ধের অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে নাটকের কেন্দ্রে থাকা 'হিম্মতমাই'র উপর। 'হিম্মত মাই' ব্রেখ্‌ট এর 'মুরাট কুরাজ উন্ড ইওরে' (হিম্মত মাই ও তার সন্তানেরা) অবলম্বনে রাচিত। অনুবাদক নীলাভ এর ভারতীয়করণ করেছেন, যেখানে ইউরেপের বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র তরাই এ পরিণত, সপ্তদশ শতাব্দীর রক্তক্ষয়ী থার্টি ইয়ারস্ ওয়ার-ও তরাই এর সংঘর্ষ হয়ে ওঠে অনায়াসে এবং রোমান-ক্যাথলিক প্রটেষ্টান্টদের স্থান অধিকার করে জটাধারী ও তিলকধারীরা। ভাষান্তরে তিনি ব্রেখটের ধারালো শৈলীকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন।

হিম্মতমাই জীবনযুদ্ধের এক লড়াকু সৈনিক, যে তার জীবনের একমাত্র সম্বল গাড়ীটিকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের রসদ বিক্রি করে পেট চালায়, সন্তান পালন করে। যুদ্ধ তার কাছে আর্শীবাদ, সে চায় যুদ্ধ যেন না থামে — যুদ্ধ থামলে তার জীবনও যে থেমে যাবে। কিন্তু যুদ্ধ এক এক করে মারতে থাকে তার সন্তানদের। আত্মরক্ষার তাগিদে নিজের মৃত সন্তানকে সে চিনতে অস্বীকার করে, মুখ ফিরিয়ে নেয়। (ঊষা গাঙ্গুলির নীরব অভিনয়ে মুহূর্তটি বাঙময় হয়ে ওঠে) একদিকে সে সন্তানের মা এবং অন্যদিকে যুদ্ধের চতুর ব্যবসায়ী — এ দুই এর টানাপোড়েনে ক্ষত-বিক্ষত হিম্মতমাই এর বেদনাকে নাট্যকার রূপায়িত করেননি, কিন্তু তবু তা পাঠকের হৃদয়কে মোচড় দেয়, যা ঊষা গাঙ্গুলীর দক্ষ অভিনয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। শেষ সম্বল কন্যাকে হারিয়েও হিম্মতমাই যোদ্ধাদের পিছনে গাড়ী ঠেলতে থাকে — জীবনের গাড়ী। আক্ষরিক অর্থেই বেঁচে থাকার লড়াই করেছে হিম্মতমাই।

হিন্দি 'গুড়িয়া ঘর' দিয়ে যাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই 'রঙ্গকর্মী' প্রথম বাংলা নাটক করলেন নিরানব্বই সালে 'মুক্তি' — মহাশ্বেতা দেবীর 'নিজের জন্য' গল্প অবলম্বনে একটি পুরুষ বর্জিত নাটক।

'মুক্তি'র পরে যে বাংলা নাটকটি করেছেন ঊষা গাঙ্গুলী সেটি একটি একক নাটক, তারই রচনা নির্দেশনা এবং উপস্থাপনা। এ ঊষার আত্মঅন্বেষণ — যা তিনি 'গুড়িয়া ঘর' এর মুনিয়া, 'লোক কথা'র সাবিত্রি, 'ঘর আউর বাহির' এর বিমলা, 'বামা', 'হিম্মতমাই', 'বেটি আয়ি' ও 'রুদালী'তে খুঁজছেন, সেই সমস্ত চরিত্রের মধ্যে তাঁর যে একাত্মতা, তাঁর যে রূপান্তর এবং অনুভবের উত্তরণ ঘটেছে তা তিনি একটি মালায় গেঁথে গড়ে তুলেছেন — 'অন্তরযাত্রা', এ যেন ঊষার নিজের দিকেই যাত্রা, নিজেকে খোঁজা। নাটকে একবার নিজেই বলেছেন 'কী রকম নারীবাদী নারীবাদী মনে হচ্ছে, না?' হয়তো 'নারীবাদ' শব্দটির প্রতি অনেকের বীতরাগ থাকায় এ সংলাপটি তিনি উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু রঙ্গকর্মীর নাটকের ধারাবাহিকতা নারীমুক্তির পথেই — একথা আমরা বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করেন ঊষাও নইলে সমস্ত চরিত্র বেয়ে তার অনুভূতি, বক্তব্য থিতু হতনা 'স্ত্রীর পত্র' এর মৃণালের উপলব্ধিতে — '... আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ, যার চোখে ভাল লেগেছে সেই সুন্দর, সমস্ত

আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখেছেন ... আমি বাঁচবো আমি বাঁচলাম।'

ঊষা শুধু যে নাটকের চরিত্রদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন তা নয়, তিনি একাত্ম হয়েছেন অভিনেত্রীদের জীবনের সঙ্গেও তাই রুদালীর অভিনেত্রী আফসারী বেগমের জীবনে তিনি অনায়াসে প্রবেশ করেন। জীবন থেকেই সংগ্রহ করে নেন তিনি নাটকের রসদ। তাঁর সর্বশেষ নাটক খেলাগাড়ীতেও তিনি জীবনকে আশ্রয় করেছেন।

'খেলাগাড়ী' আরেক 'হিম্মতমাই' এর গল্প। এই হিম্মতমাই এর নাম জোহরা বিবি, খড়দহের বাসিন্দা, পেশায় রিকশা চালক — ভ্যান রিক্শা। শিশু সন্তান নিয়ে বিধবা হওয়ার পর তিরিশ বছর ধরে রিক্শা চালান। ব্রেখ্ট এর হিম্মতমাই -র ছিল একটা গাড়ী যা থেকে তার পেট চলতো, জীবন আর গাড়ী হয়ে উঠেছিল তার কাছে সমার্থক জোহরা বিবির কাছেও তাই। এই নাটকের সবচেয়ে বড় পাওনা হল স্বয়ং জোহরা বিবি এই নাটকে অভিনয় করছেন, এবং তারাও, যারা জোহরা বিবির সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িত। জোহরা বিবির সংগ্রাম, দুঃখ-যন্ত্রণা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা শুনে শুনে এই নাটকের 'নন ফরমাল স্ক্রিপ্ট' তৈরী হয়েছে।

নাটক যে জীবন থেকেই উঠে আসে তাই প্রতিষ্ঠা করেছেন ঊষা এই নাটকে। শুধু নাটকের 'গল্প' নয় অভিনেতা অভিনেত্রীও তারাই — সত্যিই অভিনব। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে মঞ্চে। জোহরা বিবি চায় 'আমি আমার জীবন যাপনে যে হিম্মত দেখিয়েছি সেই হিম্মত যেন অন্য মেয়েরাও দেখাতে পারে।' জোহরা বিবিদের মনে এই আত্মশক্তি জাগ্রত করাতেই 'রঙ্গকর্মী' তথা ঊষা গাঙ্গুলীর নাট্যকর্মের সার্থকতা।

আমরা লক্ষ করলম প্রস্তুতি পর্বের নাটকে নারী অবলা, পুরুষ তার বিধাতা — নারীর বাঁচা/মরা সবই পুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তাদের নিজস্ব ইচ্ছা বলে কিছু তৈরী হয়নি। তাদের সামাজিক, মানসিক, নৈতিক অবস্থান পুরুষ সাপেক্ষ, পুরুষের প্রয়োজন চরিতার্থতাই বেঁচে থাকার একমাত্র কারণ। সে প্রয়োজন যৌন হতে পারে, সংসার-সন্তান পালন হতে পারে, মানসিক হতে পারে কিংবা একাধারে সবই। সেই চাহিদার জায়গা থেকেই বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, সতীদাহ প্রথা এবং আশ্চর্য হলেও সত্যি পুরুষের চাহিদার জায়গা থেকেই ঐ প্রথার বিলোপ। ব্যাপারটা একটু খুলে বলা যাক্ — ব্রিটিশের হাত ধরে আগত উদীয়মান পুঁজিবাদ (যে উন্নত দর্শন, সংস্কৃতির, বিজ্ঞান সাধনার ধারক-বাহক) এর সংস্পর্শে এসে সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষের চেতনার জগতেও আলোড়ন ঘটাল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে একদিকে সৃষ্টি হল এক মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণীর, অন্যদিকে কলকারখানা, রেলওয়ে ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন শ্রমিক

শ্রেণীর। এই সময়ে পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় আঘাত না হেনে নতুন ব্যবস্থার পত্তন সম্ভব ছিল না। এই নতুন আদর্শকে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজনে, এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকারের জরুরী চাহিদা দেখা দিল এদেশীয় এক শিক্ষিত শ্রেণীর, যারা হবে 'চেহারায় কালা, চেতনায় ব্রিটিশ' — (মেকলে)। মধ্যসত্ত্বভোগীদের মধ্যে থেকেই প্রধানত গড়ে উঠলো ঐ শ্রেণী। তারা জানলেন পৃথিবীর ইতিহাস, ইওরোপীয় রেনেসাঁর গৌরবময় ঘটনা। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই সনাতনী প্রথা-রীতি-আচরণ প্রশ্নের মুখোমুখি হল, নারী সম্পর্কিত ভাবনাতেও স্বাভাবতই এল আলোড়ন। নারী শিক্ষা, নারীকে বাইরের জগতের সঙ্গে যুক্ত করার প্রক্রিয়া গড়ে উঠলো, স্ব-স্বার্থেই ব্রিটিশরা তাকে পূর্ণ সহযোগিতা করলো। নবজাগরণের ফলে পুরুষ কর্তৃক নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই এর মূল কারণ এর মধ্যে নিহিত আছে।

পাশ্চাত্য ভাবধারা এবং শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষদের উপযুক্ত সঙ্গিনী তৈরী এবং শাসক শ্রেণীর মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষে নারীর অবরোধ মুক্তি ও নারী শিক্ষার প্রচেষ্টা শুরু হলেও এই লক্ষকে ছাড়িয়ে নারীর স্বয়ংস্বতন্ত্র সত্তা (নারীসত্তা) হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই প্রচেষ্টাকেই চিহ্নিত করতে হয়। এই সময় একদিকে সামাজিক আন্দোলনের তীব্রতা, অন্যদিকে নারীর দুঃখ-দুর্দশা, না-মানুষ অবস্থা নাট্যকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং নাটকে নারীর বাস্তব চিত্রণ সম্ভব হয়। কিন্তু নারী সম্পর্কিত ভাবনায় সাহিত্যিকদের মনোজগতে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, বাস্তব জীবনে তা হয়না। তাই নারীর দুঃখ-দুর্দশার বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হলেও, ব্যক্তিনারীর প্রতিষ্ঠার জন্য নাট্যকারদের হাত বাড়াতে হয় পুরাণ বা ইতিহাসের স্বপ্নলোকে। যা লক্ষিত হয় মধুসূদনের নাটকে।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ শাসনের বীভৎস রূপ বেরিয়ে পড়েছে। তাদেরই মদতপুষ্ট এদেশীয় মধ্যশ্রেণীর সঙ্গে তাদের স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়েছে। এদেশীয় মানুষ নিজ উদ্যোগে কলকারখানা গড়ছেন, হস্তশিল্প গড়ে উঠছে, জাতি চাইছে স্ব-নির্ভর হতে, তখন স্বভাবতই ব্রিটিশের সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত দেখা দিল। তারা এই বিকাশকে স্তব্ধ করে দিতে চাইল, প্রতিক্রিয়ায় মাথা তুললো জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। জাতীয় চেতনা গড়ে তুলতে আশ্রয় নেওয়া হল ভারতের ঐতিহ্য গরিমার। দেখা দিল 'হিন্দু পুনর্জাগরণবাদ' সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু পরিবার প্রথাকে মহিমান্বিত করে তোলা হল। দেখানো হল নারীর প্রেম-ত্যাগ-তিতিক্ষা আর চরম সহিষ্ণুতা গৃহকে কি মধুর করে রেখেছিল, ফলে গোটা সমাজেই এক সুষ্ঠ-সমন্বয়ের বাতারবণ তৈরী হয়েছিল। আসলে হিন্দু পরিবারকে পবিত্র এবং তার অবস্থাকে কাম্য অবস্থা হিসেবে দেখানোর রাজনৈতিক প্রয়োজন যে ছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। পরিবারই ছিল হিন্দু পুরুষদের কাছে শেষ স্বাধীন ক্ষেত্র, সেখানে তার ইচ্ছামত সব কিছু ঘটে। বাইরে যেখানে তাকে (পুরুষ) জোর করে বশ্যতা

স্বীকার করতে হয় সেখানে পরিবারে সে পায় স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত বশ্যতা — যা তার অহংকে তৃপ্ত করে। হিন্দু পরিবারকে হিন্দু ধর্মের অংশ হিসেবে দেখানো হল, ফলে জাতীয়তাবাদী নাটকে হিন্দু পরিবার ও হিন্দু নারীর আদর্শায়িত রূপ ফুটে উঠতে লাগলো। দীনবন্ধু মিত্রর নীলদর্পন থেকে শুরু করে গিরিশ ঘোষ পর্যন্ত যা বিস্তৃত। মাঝখানে ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিকতা (যা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়) ও স্বতন্ত্র ভাবাদর্শ, নারীকে সংস্কৃত (Cultured) মার্জিত পুরুষের কাঙ্খিত ভাবমূর্তিতে রূপান্তরিত করলো, তারা হল আত্মিক শক্তিতে ভরপুর, শুভবুদ্ধি, প্রেম ও মধুরের প্রতীক।

তিরিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত (স্বাধীনতার কিছু সময় বাদ দিয়ে) ভারত বর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল উত্তপ্ত। এই সময়ের নাটকে তাই স্বাভাবিক ভাবেই জায়গা করে নিয়েছে শ্রেণী সংগ্রাম। যেখানে প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রেণী সংগ্রামের কাহিনী নেই, সেখানেও কোন প্রগতিশীল বা ব্যাপকার্থে রাজনীতিই বিষয় হচ্ছে। লিঙ্গ সচেতন ও লিঙ্গ বৈষম্যের ছবিও পাওয়া যাচ্ছে, প্রতিবাদী ভূমিকায় নারীকে পাওয়া যাচ্ছে (চাক ভাঙা মধু, টিনের তলোয়ার, জগন্নাথ ইত্যাদি), যদিও তাদের অধিকাংশের বাস মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাইরে। মতাদর্শগত কারণেই এই সময় নিম্নবিত্ত মানুষেরা চেতনার কেন্দ্রে উঠে আসছিল, স্বভাবতই ঐ শ্রেণীর নারীরাও।

কিন্তু আশির দশক থেকেই নাটকে (সামগ্রিক বিচারে) নারীর ভূমিকা গৌণ হয়ে যাচ্ছে, নিস্ক্রিয়তা ও নৈঃশব্দের অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে তাদের মুখ। আপাত রাজনৈতিক স্থিতিতে, রাষ্ট্রনৈতিক/সমাজনৈতিক নাটকের জায়গা দখল করছে পারিবারিক/মানসিক সংকটের নাটক। নারী ফিরে যাচ্ছে ঐতিহ্যিক ভূমিকায়, যদিও বাস্তব আর্থ সামাজিক কারণে সেই ভূমিকার কিছু বদল ঘটেছে — সে শুধু কন্যা-জায়া-জননী নয়, অফিসের বসের পি.এ, কেরাণী , নার্স, শিক্ষিকা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র ইত্যাদি, কিন্তু সর্বোপরি সে একজন নারী। তাই সমাজ স্বীকৃত 'কোড অব কন্ডাক্ট' অনুযায়ী সে কাম্য-কাঙ্খিত। অর্থাৎ একাধারে সে বুদ্ধিমতি, শিক্ষিতা, চাকুরীরতা আবার সুন্দরী আকর্ষণীয়া, নম্র-ভদ্র, ত্যাগ-তিতিক্ষা আর সহনশীলতার প্রতিমূর্তি— পারিবারিক মান মর্যাদার প্রতীক। নাটকে এই সমাজ নির্দিষ্ট ভূমিকাতেই তাকে দেখা যাচ্ছে, এর বাইরে গেলে সে চিহ্নিত হচ্ছে, অঙ্কিত হচ্ছে 'খারাপ মেয়ে' বলে।

নব্বই এর দশক থেকে এই মেয়েদের মধ্যে দেখা যেতে লাগলো অদ্ভুত বৈপরীত্য — ইতিমধ্যে নারীর শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে, টেক্‌নোলজির বিপ্লব সারা দুনিয়াকে এনে দিয়েছে মানুষের হাতের মুঠোয়, নারীর জল-স্থল-মহাকাশ জয় উজ্জীবিত করছে পৃথিবীর প্রতিটি কোণের নারীকে, নারীর আত্মশক্তি বাড়ছে, সে কোন অংশেই পুরুষের তুলনায় নিজেকে হীন ভাবতে পারছেনা। ফলে পরিবার ও কর্মক্ষেত্র উভয় জায়গাতেই নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব বাড়ছে, সেই সঙ্গে বিশ্বায়নের সংস্কৃতি মেয়েদের শরীরি

ভাবনায় (পোষাক, যৌন-নৈতিকতা ইত্যাদি) ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। নিজেকে 'স্বাধীন সত্তা' হিসেবে উপলব্ধি করছে (যখন কার্যত সে পরিণত হচ্ছে পণ্যে) অথচ একই সঙ্গে সে নিজেকে যুক্তিহীন বিশ্বাসের গন্ডীতে আবদ্ধ করে রেখেছে, সুগৃহিণী ও সুমাতার ভূমিকাতেই জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে পাচ্ছে কিংবা শারীর প্রদর্শন ও জরায়ুর স্বাধীনতাকেই প্রকৃত স্বাধীনতা বলে ভাবছে। এই বৈপরীত্যের কারণ খুঁজতে বিশ্বায়নের অর্থনীতিতে পৌঁছে যেতে হয়।

একটা সমাজ কতটা উন্নত তা বোঝা যায় সেই সমাজে নারীর অবস্থা দেখে, আবার সমাজের বিকাশের মাত্রার একটা মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয় প্রযুক্তি বিকাশকে। প্রযুক্তির উন্নতি উৎপাদনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়, সেই সঙ্গে ঘটায় সামাজিক সংগঠন ও বিন্যাসের বদল। খনি, রেলওয়ে, বিদ্যুৎ, সাম্প্রতিক প্রযুক্তি-বিপ্লব সবই এর উদাহরণ। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটায়, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বর্ধিত ও উন্নত পণ্যের যোগান জীবন-যাত্রার মানকে উন্নত করে, সেই সঙ্গে বাড়ে অবসর। ফলে সংস্কৃতি, দর্শন, শিল্প ইত্যাদির, এক কথায় উপরি কাঠামোর ক্ষেত্রেও অগ্রগতি ঘটে। মানুষের চেতনার জগতেও অগ্রগতি ঘটে চলে — তাই উন্নত প্রযুক্তির সমাজ মানে উন্নত চেতনার সমাজও বটে — সাধারণভাবে এটাই হল ধারণা।

কিন্তু ব্যাপারটা এই ভাবে হয় তখনই, যখন বিকাশ ঘটে স্বাভাবিক গতিতে, সমাজের নিজস্ব চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে, অর্থাৎ বিকাশ ঘটে তলা থেকে। সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংস্কারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে সামাজিক সংস্কার, শিক্ষার বিস্তার, কুসংস্কার বিরোধী সংগ্রাম, পশ্চাদ্‌পদ চিন্তার বিরুদ্ধে লড়াই, নারী শিশু ও সমাজের দুর্বলতর অন্যান্য অংশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতেও ঘটে পরিবর্তন।

কিন্তু সংস্কার যদি ঘটানো হয় 'ওপর থেকে', যদি সামাজিক চাহিদার জায়গা থেকে অর্থাৎ 'তলা থেকে' তা উঠে না আসে তাহলে তাতে অর্থনৈতিক আশু প্রয়োজন মিটলেও সামাজিক চেতনার বিকাশে তা সরাসরি ভূমিকা রাখেনা।

আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশগুলি যখন কৃষির উপর জোর দেওয়া, ভূমি সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে কৃষির বিকাশ ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়া ও তার উপর ভিত্তি করে বৃহৎ শিল্পের দিকে এগুনো — এই পথ ছেড়ে, উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করে বৃহৎ শিল্প গড়ার পথে যায় এবং অনিবার্য ভাবেই ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে ও ক্রমশ বেশী করে উন্নত দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখন স্বাধীন পুঁজির বিকাশ আরো বেশী ব্যাহত হয়। ফলে সামন্ততান্ত্রিক চেতনার বিরুদ্ধে লড়াইটা যায় দুর্বল হয়ে। তাছাড়া জাতীয় চেতনা বিকাশ — যা সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই না করে এগুতে

পারে না — তা ঐ বৈদেশিক পুঁজির স্বার্থের বিরোধী বলে তারা নানাভাবে ঐ পশ্চাদমুখী সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে। ঊণবিংশ শতকের শেষ দিকে যখন বিশ্ব জুড়ে মহাজনী পুঁজির (FinanceCapital) আধিপত্য শুরু হল তখন থেকেই এই প্রক্রিয়া শক্তিশালী হল। ধর্মকে, নানান প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কারকে, পরিবার প্রথাকে মহিমান্বিত করা, বিভিন্ন প্রগতি-বিরোধী গোষ্ঠী ও দলকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে শক্তিশালী করা, স্বাধীন জাতীয় পুঁজির বিকাশে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরী করা — ঋণ, পুঁজি ও কারিগরি জ্ঞান সরবরাহের শর্ত হিসেবে এসব চললো। ফলে একদিকে উন্নত প্রযুক্তি, অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক চেতনার সহাবস্থান টিকে রইল — যা নারীর পরস্পর বিরোধী আচরণের আসল কারণ বলে মনে করি।

তবে নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যা কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে তা শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যদিও বিজ্ঞাপন ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের দৌলতে নিম্নবিত্তের নারীরাও প্রভাবিত হচ্ছে। কিন্তু রুটি-রুজির লড়াইটা চালিয়ে যেতে হয় বলে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই জীবনযুদ্ধের সঙ্গে এক হয়ে যায় — যা ঊষা গাঙ্গুলীর অধিকাংশ নাটকের উপজীব্য। হিম্মতমাই থেকে জোহরা বিবি সবাই এর উদাহরণ।

রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক থেকে শুরু করে আজকের 'চারদুয়ার' বা 'মুখোশ' পর্যন্ত বাংলা নাটকের ধারায় নারীসত্তার অন্বেষণে যাত্রা করে আমরা উত্তরণের কয়েকটি পর্ব খুঁজে পেয়েছি — রামনারায়ণ-উমেশচন্দ্র ও কয়েকজন অপ্রধান নাট্যকারের নাটকে নারীর যে বাস্তব না-মানুষী অবস্থা চিত্রিত হয়েছে তাকে আমরা বলছি 'অসচেতন পর্ব'। মধুসূদন থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই ধারাকে বলছি 'ঐতিহ্যিক পর্ব' — ঐতিহ্যের অনুকরণই এই সময়ের মূল প্রবণতা। দ্বিজেন্দ্রলালের পর থেকে মোটামুটি '৭০-এর দশক পর্যন্ত 'লিঙ্গ সচেতন' পর্ব — এই সময়ে সচেতন প্রতিবাদী মেয়েদের পাওয়া যাচ্ছে। '৭০-এর দশক থেকে '৯০ পর্যন্ত সময়ের নাটককে বলছি 'আত্মঅন্বেষণকারী পর্ব'। Identity Crisis থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই এ যাত্রা এই সময়ে লক্ষ করা যাচ্ছে। যদিও এর বিপরীত প্রবণতাও লক্ষিত হচ্ছে। '৯০ থেকে বর্তমান পযন্ত সময়কে আমরা বলছি 'আত্ম-আবিষ্কার পর্ব'। এখানে বলে নেওয়া ভাল নারীর উত্তরণের যাত্রায় সময়ের মূল প্রবণতাকেই শুধু চিহ্নিত করা হয়েছে। এক সময়ের বৈশিষ্ট্য অন্য সময়ে পাওয়া যাচ্ছেনা এমনও নয়।

তবে 'আত্ম আবিষ্কার' পর্বে স্পষ্টতই দুটি ঝোঁক লক্ষ করা যাচ্ছে — 'খেলাগাড়ী'-র জোহরা বিবি লড়াই করে বেঁচে থাকার মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পায়, আর চারদুয়ারের 'মা' অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও জরায়ুর স্বাধীনতার মধ্যেই নিজেকে আবিষ্কার করে, ছোট মেয়ের দুইজন পুরুষের সঙ্গে একত্রে বাস করার ইচ্ছার মধ্যে যা আরো প্রকটিত হয়।

কিন্তু এরাই কি একবিংশ শতাব্দীর কাঙ্ক্ষিত নারী? মুক্তির আকাশে ডানা মেলা সেই সম্পূর্ণ নারীর দেখাতো পাওয়া গেল না! সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক ভাবে স্বাধীন, আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান, কন্যা-জায়া-জননী ছাড়াও একজন পরিপূর্ণ মানুষ রূপে নারীর দেখা পাওয়া গেল না কোন নাটকেই। একথা সত্যি যে ক্রমশঃ নারীর অবস্থার সদর্থক পরিবর্তন ঘটছে। নারী শিক্ষার হার বাড়ছে, কর্মজগতে নারীকর্মীর সংখ্যা বাড়ছে, চিন্তা-জগতেও নারী-পুরুষ উভয়েরই পরিবর্তন আসছে; তবু নারী মুক্তি ঘটে গেছে এমন কথা কেউই বলবেন না। নারী অধিকারের সম্প্রসারণ ঘটেছে, তবে সমাজে সার্বিকভাবে নারী মুক্তি ঘটে নি — বস্তুত বর্তমান সমাজ কাঠামো অটুট রেখে নারী মুক্তি সম্ভব নয়, যদি নারীমুক্তির অর্থ হয় সমাজের সর্বস্তরের নারীর মুক্তি। অধিকারের সম্প্রসারণ ও মুক্তি এক কথা নয়। যেমন — দাস ব্যবস্থায় দাসেদের অধিকারের সম্প্রসারণ তাদেরকে কিছুটা ভাল রাখতে পারে, তাদের ওপর অত্যাচারের বোঝা কিছুটা লাঘব করতে পারে, কিন্তু তাতে তাদের মুক্তি ঘটে না, কারণ অত্যাচারের বুনিয়াদটা থেকেই যায়। মুক্তির জন্য প্রয়োজন ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন, যেখানে দাস ও মালিক এই সম্পর্কের-ই অবসান ঘটে। নারীমুক্তির প্রশ্নেও একথা প্রযোজ্য।

তবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেই নারীরা পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যাবে এমন নয়, কারণ এতদিনের চিন্তা প্রক্রিয়া ও অভ্যাসের ছাপ সমাজে বিভিন্ন ভাবে থেকে যাবে। যেগুলো নির্মূল করার এক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে গোটা সমাজকে। যা হবে সমাজের উপরিস্তরের পরিবর্তন। আমাদের মনে হয়েছে অধিকাংশ নারীবাদী সংগঠন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা অটুট রেখে উপরিস্তরের সংস্কারে বেশী মনোযোগী হয়েছেন, ফলে পরিবর্তন একটা ঘটছে ঠিকই, কিন্তু তা সীমাবদ্ধ থাকছে সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত নারীদের মধ্যেই। যে বিপুল সংখ্যাক নারী সমাজের নীচের তলায় বাস করে, তারা সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়, অধিকার সম্প্রসারণের ফলটুকুও তারা ভোগ করতে পারে না।

বস্তুত পক্ষে অসম সামাজিক ব্যবস্থায় উপরতলার নারীদের সমস্যার সঙ্গে এই বিরাট সংখ্যক নারী একাত্মবোধও করে না, ফলে মুক্তির অর্থ এদের কাছে ভিন্ন। তাই মনে হয় বর্তমান সমাজ কাঠামোয় বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু নারী পূর্ণমুক্তি অর্জন করতে পারে না (অধিকারের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে নিজের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন আনতে পারে, যা প্রয়োজনীয় এবং অবশ্যম্ভাবী); তখন মুক্তির অর্থ অনেকের কাছে হয়ে দাঁড়ায় পুরুষের সমান হওয়া—পুরুষের সমানাধিকার অর্জনই শুধু নয় (সমানাধিকার অবশ্যই কাম্য), পোষাক-আসাক, আচার - ব্যবহার, অভ্যাস - কুঅভ্যাস সমস্ত আয়ত্ত করাই নারীমুক্তির চরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এর থেকে নানা বাড়াবাড়ি দেখা দেয়। দেবাহুতি (অলকানন্দার পুত্র-কন্যা / মনোজ মিত্র) বা চার দুয়ারের ছোটমেয়ের মধ্যে যা লক্ষ করা যায়। কিন্তু পুরুষ নয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাটাই উপড়ে ফেলা দরকার।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্য ঃ দু' চারটি কথা — যশোধরা বাগচী, গ্রন্থ: ভারত ইতিহাসে নারী, সম্পা: রত্নাবলী চট্টো. ও গৌতম নিয়োগী, কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, কল, ১৯৮৯, পৃ: ১২৬

২। 'নারী প্রগতি ঃ আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ রমণী — গোলাম মুরশিদ, নয়া উদ্যোগ, কল, ২০০১, পৃঃ ২২

৩। 'রবীন্দ্রনাথের নাটকে মেয়েরা'—সুতপা ভট্টাচার্য

৪। মৃণাল অন্য ইতিহাসের স্বাক্ষর / তনিকা সরকার। দেশ, ৫ই আগষ্ট, ২০০০

৫। কলকাতার নাট্যচর্চা — রথীন চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমি, পৃঃ ৬৫

৬। বাংলা রূপান্তর নাটকের তিন দশক — হীরেন্দ্র কুমার রায়/'অনুষ্টুপ' নাট্য সংখ্যা, পৃঃ ১২৬

৭। Theatre and Politics - Kuntal Mukhopadhyay, Bivas, Kol, 1999, P. 139.

৮। নাটকের নারী পরিচালক ঃ কিছু ব্যক্তিগত ভাবনা — জয়তী বসু, লৌকিক উদ্যান, মানবী সংখ্যা ১৯৯৯, পৃঃ ৬০৮

৯। গ্রুপ থিয়েটার ঃ ষষ্ঠ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা ঃ ১৯৮৩

১০। Women's Theatre– Ranjita Biswas, The Indian Nation, 10.05.2002.